আনন্দমেলা



৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
১
আনন্দবাজার-প্রকাশন



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

আনন্দমেলা

৩০ মাঘ ১৩৮৬ • ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ • ৫ বর্ষ • ১৯ সংখ্যা

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তুষার-রাজ্যে

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

ইউরোপের উত্তর দিকের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে আশ্চর্য এক দেশ, তার নাম ল্যাপল্যান্ড। ল্যাপল্যান্ডের তুষার-ঢাকা প্রান্তরে মানুষজন ধরতে গেলে চোখেই পড়ে না। বছরের গড়পড়তা তাপ এখানে শূন্যের নীচে থাকে। শীতকালে তাপ নেমে যায় শূন্যের অনেক, অনেক নীচে। এই ল্যাপ-ল্যান্ডের প্রায় মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে চলে গেছে সুমেরুবৃত্ত। এর উত্তরে গ্রীষ্মকালে সূর্য অস্ত যায় না, আর শীতকালে থাকে চির-অন্ধকার।

ল্যাপল্যান্ডের এইরকম বর্ণনা তো আমরা সবাই ছোটবেলায় ভূগোল বইতেই পড়েছি। কিন্তু সত্যিই যে একদিন ল্যাপল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ হয়ে যাবে, তা তো তখন ভাবিনি। সেবার সুইডেনে থাকার সময় উপসালা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ লেনার্ট স্ট্রমকুইস্টের কাছে জানলাম যে, গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার আগেই বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এক দল বিজ্ঞানী যাবেন সুমেরুবৃত্তের ওপারে, সুইডিশ ল্যাপ-ল্যান্ডে। সাগ্রহে তাঁদের সংগী হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন ছুটোছুটি করে মেরু-অঞ্চল ভ্রমণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করলাম। তারপর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় একদিন বিকেলে একটা ছোট ব্যাগে গরম পোশাক ও একটা রুকস্যাকে অভিযানের সরঞ্জাম নিয়ে সংগীদের সঙ্গে উত্তরগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

সুমেরুবৃত্তের ওপারে রেললাইন আছে শুনে তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছ। এখানে বলে রাখি, একমাত্র সাইবেরিয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও এত উত্তরে রেললাইন নেই। উত্তর সুইডেনের কিরুনায় আছে একটি বিখ্যাত লোহার খনি। এই খনির লোহার আকর সমুদ্রগামী জাহাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই বহু কষ্ট করে তৈরি হয়েছে এই রেল-পথ। এই একটিমাত্র রেলপথ ও কিছু পায়ে চলা পথ ছাড়া এখানে আর কোনো রাস্তা নেই।

ভোরবেলা ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখে-ছিলাম দুদিকে শুধু পাইন গাছের সারি। মাঝেমধ্যে বড় মাপের হ্রদও চোখে পড়ছিল। ট্রেনের ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা আছে। সব জানলা পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা। তাই বাইরের আবহাওয়া যে কতটা পালটে গেছে





আবিস্কোর অরণ্যপথ। চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ

গাড়িতে বসে বুঝতে পারিনি। ভোরে প্রায় হাজার কিলোমিটার উত্তরে বোডেন স্টেশনে নামতেই এক ঝাপটা হিমেল হাওয়া শরীরের ভেতরটাও কাঁপিয়ে দিল। বোডেনে ট্রেন বদল করে ছোট ট্রেনে উঠেই বুঝলাম যে, যাত্রীদের প্রায় সবাই হয় পর্যটক নয় অভিযাত্রী।

বেলা ন'টা নাগাদ ইঞ্জিনের তীক্ষ্ন বাঁশির শব্দে চমকে উঠলাম। ট্রেনের গতিও একটু মন্থর হল। লেনার্ট চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "আমরা সুমেরু-বৃত্ত পার হচ্ছি। এ তারই সঙ্কেত।"

বাইরে তাকিয়ে দেখি, পাইন গাছের সারির ফাঁকে মাইলস্টোনের মতো সাদা একসারি পাথর সাজিয়ে সুমেরুবৃত্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মেরুবৃত্ত পার হওয়ার অল্প পরেই এল কিরুনা রেলস্টেশন। স্টেশন থেকেই কিরুনার বিখ্যাত লোহার খনি দেখা যায়। দুপুরবেলা আবিস্কো রেলস্টেশনে যখন আমরা নামলাম তখন তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তাড়াতাড়ি গরম জামার ওপরে নাইলনের বর্ষাতি চড়িয়ে নিলাম।

রেলস্টেশন থেকে আমরা গেলাম আবিস্কোর রিসার্চ স্টেশনে। মেরু-অঞ্চল নিয়ে গবেষণার জন্য সুইডিশ আকাদেমি এই

পাহাড় বেয়ে নামছে জলপ্রপাত



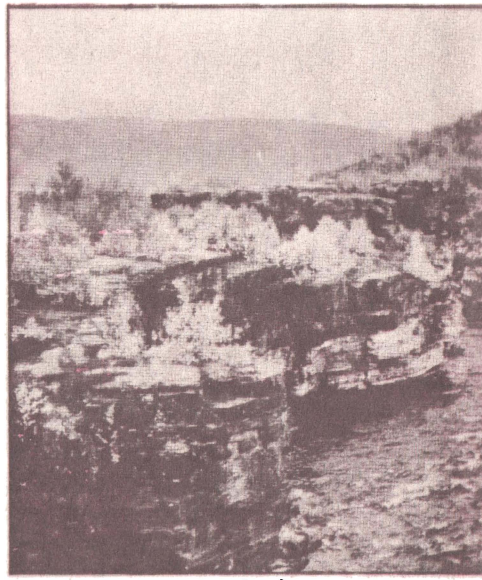
স্টেশনটি পরিচালনা করেন। এখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এখানকার সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ নিলস ওকে অ্যানডারসনের সঙ্গে আলাপ হল। ও'র সম্পর্কে একটা গল্প আগেই শুনেছিলাম। সুইডিশ আকাদেমি এই রিসার্চ স্টেশনটির জন্য একজন স্থায়ী অধ্যক্ষ খুঁজছিলেন, কিন্তু কেউই এই তুষাররাজ্যে সারা বছর থাকতে চাইছিলেন না। দক্ষিণ সুইডেনের অধ্যাপক অ্যানডারসন রাজি হলেন এক শর্তে। আবিস্কোয় তিন মাস থাকার পরে জায়গাটা যদি তাঁর পছন্দ হয় তবেই তিনি কাজটা নেবেন, না হলে নয়। মজার কথা, তিন মাস এখানে কাটানোর পর অধ্যাপক স্থির করেছেন যে, আবিস্কো ছেড়ে পৃথিবীর আর কোথাও তিনি যাবেন না।

ও'কে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন?"

উনি উত্তর দিয়েছিলেন, "কয়েকদিন আবিস্কোর চার ধারে ঘুরে দেখুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।"

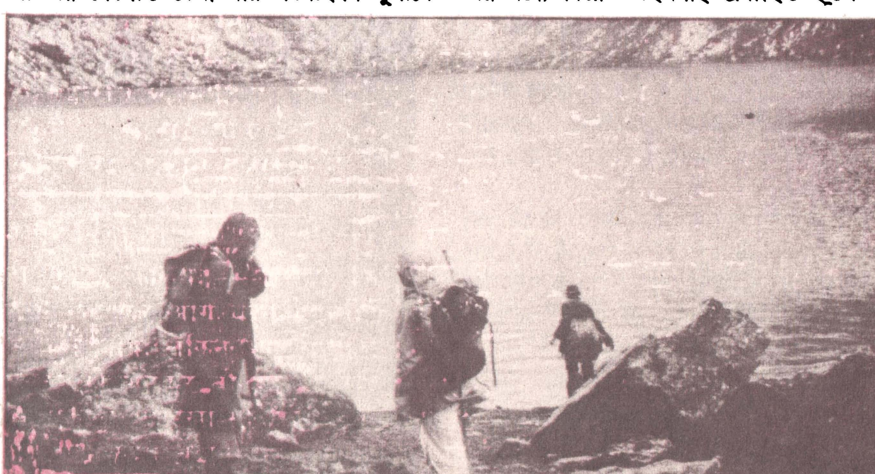
আবিস্কোয় আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল ওখানকার আকাশের এক আশ্চর্য আলোর খেলা। সারাদিন ধরে আমাদের দেশের গ্রীষ্মের বিকেলের মতো আকাশের রঙ পাল্টায়। এখানে সেপ্টেম্বরের সূর্যের আলোর যেন কোনো তাপ নেই। প্রায় চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ। সেই স্নিগ্ধ রঙিন আলোয় কোথাও দেখা যায় সীমাহীন তুষারে



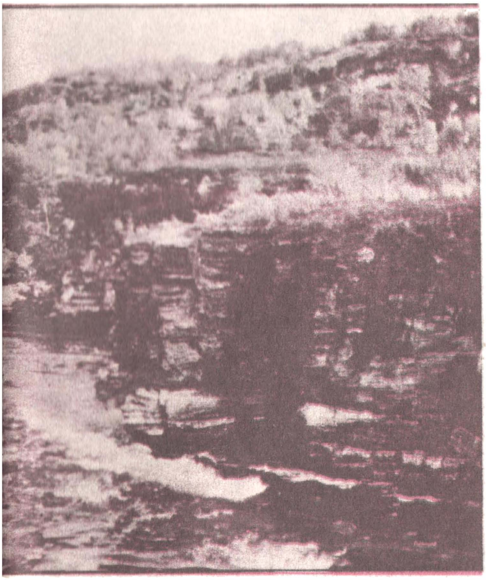
দু-দিকে পাহাড়, মধ্যে স্রোতস্বিনী

ঢাকা প্রান্তর, কোথাও বা খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, কোথাও বা পাথরের ফাটলে জলপ্রপাত।

সামনেই লেক টরনেত্র্যাস্ক। তার ওপারে বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি। পৃথিবীর গাছের সীমানা (tree-line) ওই-সব পাহাড়ের নীচেই শেষ হয়ে গেছে। পাহাড়ের মাঝে বিশাল "ইউ" আকৃতির উপত্যকা। কোন প্রাচীনকালে তার মধ্যে দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হত। এ



[illegible] ধারে অভিযাত্রীরা



এক অন্য জগৎ।

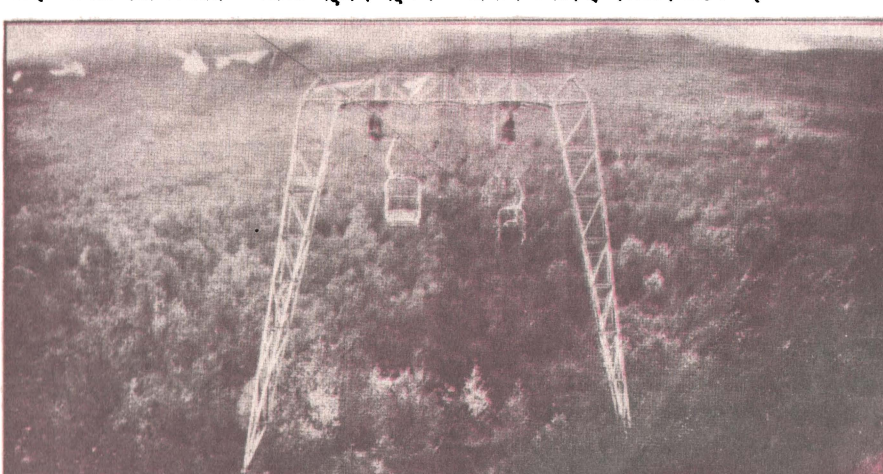
রিসার্চ স্টেশনের কাছেই গোল গোম্বুজের মতো একটি পাহাড়। এই ন্যুলইয়া (Nulja) পাহাড়ে দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা স্কীর কলাকৌশল রপ্ত করতে আসেন। এই পাহাড়টির মাথায় যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রোপওয়ের ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের উপরে চড়লে অনেকদূর দেখা যাবে। তাই আমরা রোপওয়ের খাঁচায় দুজন দুজন করে বসে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। আমাদের স্থানীয় গাইডটি একটি 'ওয়াকি-টকি রেডিও ট্রান্সমিটার' সঙ্গে নিলেন, যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে! রোপওয়ের খোলা খাঁচায় বসেই বুঝলাম, মেরু অঞ্চলের হাওয়া কাকে বলে। গা-হাত-পা অবশ হয়ে গেল।

কয়েকদিনের অভ্যাসেই অবশ্য এ আবহাওয়া আমাদের সহ্য হয়ে এল অনেকটা। এত ঠান্ডার দেশে সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই হেমন্ত। চারদিকের বনের সমস্ত গাছের পাতাই রঙিন হয়ে উঠেছে। অনেক নতুন ধরনের গাছও দেখলাম।

একদিন পাহাড়ের মাথায় হিমবাহ পর্যন্ত ওঠার প্রস্তাব উঠল। প্রস্তাবটা খুবই ভাল লাগল আমার। কারণ, আমাদের দেশে হিমবাহ দেখতে গেলে বহু কষ্ট করে হিমালয়ের উঁচু চূড়ায় উঠতে হয়। আর, এখানে একদিনেই হিমবাহের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

সেদিন হাতে-মুখে পুরু করে চর্বি মেখে নেওয়া হল ঠান্ডা হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচার জন্যে। গরম জামার ওপরে পরলাম হাওয়া-নিরোধক নাইলনের জ্যাকেট। পাহাড়ের নীচেই জলাভূমি। সেখানে চাই হাঁটু পর্যন্ত গামবুট। আবার নেড়া পাহাড়ে চড়ার সময় পরতে হবে মাউন্টেনীয়ারিং বুট।

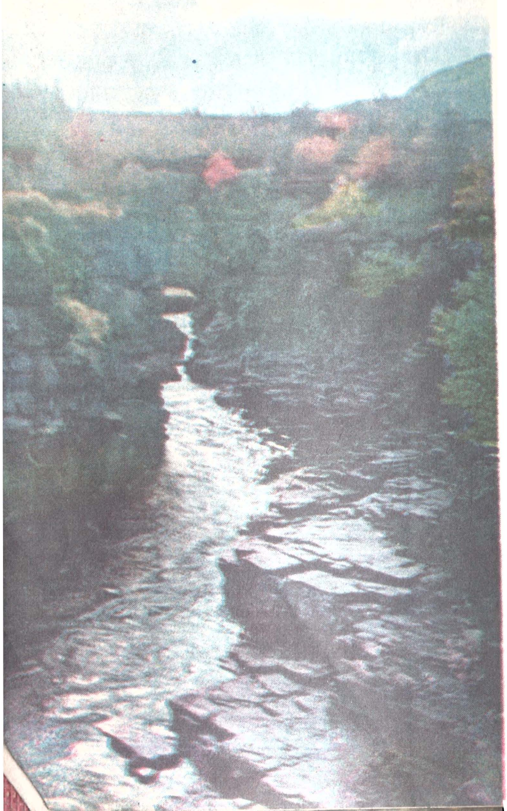
প্রস্তুত হয়ে আমরা লওকতাচোককার (Låktatjåkka) উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকেই ক্যারকেভাগে (Kärkevagge)



ন্যুলইয়ার কেব্‌ল-কার



ল্যাপল্যাণ্ডের স্লেজ



উপত্যকার শুরু। এই উপত্যকার শেষে, পাহাড়ের মাথায় আছে হিমবাহ।

পাহাড়ে কিছুটা চড়তেই বন-জঙ্গল-উদ্ভিদের রাজ্য শেষ হয়ে গেল। তারপর শুধু পাথর আর তুষার। পাহাড়ের উপর একটি হ্রদ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে হিমবাহের ধসে পড়া গর্তে এর সৃষ্টি হয়েছে। ঐ হ্রদের পাড়ে দুপুরের খাওয়ার জন্য থামা হল। স্পিরিট-স্টোভ জ্বালিয়ে যে যার টিন খুলে খাবার গরম করতে বসে গেলাম। গরম স্যুপের স্বাদটা সেদিন চমৎকার লেগেছিল। সঙ্গে ছিল সসেজ।

খাওয়ার পরে আবার পাহাড়ে চড়া। অবশেষে আমরা হিমবাহের কাছে এসে পৌঁছলাম।

পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছে একটা কাঠের কুঁড়ে-ঘর চোখে পড়ল হঠাৎ। কী আশ্চর্য! এখানে কুঁড়ে-ঘর?

আসলে, সুইডিশ আকাদেমি এটা বানিয়েছেন আমাদের মতো অভিযাত্রী-গবেষকদের জন্য। কেউ গবেষণার জন্য এখানে থাকতে চাইলে অনুমতি মিলবে। কিন্তু, একটি শর্তে। এখানে কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো আছে। এখানে যিনি রাত্রিবাস করবেন, যন্ত্রগুলির রেকর্ড ও চার্টগুলি খুলে নিয়ে

গিয়ে তাঁকে জমা দিতে হবে আবিস্কোয়। এই হল শর্ত। এভাবেই আকাদেমি এ অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ করেন। কুঁড়ের ভিতরে পাঁচ-ছয় জনের থাকার ব্যবস্থা আছে।

বিশাল ল্যাপল্যান্ডের লোকসংখ্যা এত কম যে, স্থানীয় অধিবাসীদের দেখা মেলা ভার। তবে ল্যাপল্যান্ডের আদিবাসীদের বাসস্থানের নানা চিহ্ন এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। জঙ্গলের মধ্যে মোটা কাঠের গুঁড়ির উপর ল্যাপদের ঘরগুলি অনেকটা আমাদের দেশের গারো আদিবাসীর ঘরের মতো দেখতে। সাবেক আমলের ল্যাপদের ঘরগুলি তিনকোনা কাঠের ঝুপড়ির মতো। দরজা মাত্র একটি। কোনও জানলা নেই। ঘরের উপর পুরু মাটি ও ঘাসপাতা চাপা দিয়ে গরম রাখার ব্যবস্থা হয়।

এক জায়গায় দেখলাম নৌকোর মতো দেখতে কয়েকটি শ্লেজ গাড়ি রোদে শুকোনো হচ্ছে। তুষারে চারিদিক ঢেকে গেলে বল্গা হরিণ দিয়ে এগুলো টানা হবে।

মেরু অঞ্চলের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা না বললে গল্প বাকি থেকে যাবে। ছোট-বেলা থেকে বইতে পড়ে এসেছি যে, এই অঞ্চলের অন্ধকার আকাশে আশ্চর্য এক আলোর খেলা দেখা যায়, তার নাম অরোরা বরিয়ালিস বা মেরু-জ্যোতি। ডিসেম্বর-জানুয়ারির মেঘশূন্য অন্ধকার আকাশেই সাধারণত এই আলো দেখা যায়। লেনার্ট বলেছিলেন, ভাগ্য ভাল থাকলে সেপ্টেম্বরেই হয়ত আমরা মেরু-জ্যোতি দেখতে পাব।

রাত প্রায় দশটা। মোটা ওভারকোট আর কান-ঢাকা টুপি পরে একটা খোলা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত একটা তীব্র সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। সদ্য আলোর রেশটা মিলিয়ে যেতেই শুরু হল নানা রঙের খেলা। কে যেন নানা আকারের কয়েকটা ভেলভেটের পর্দা আকাশে ঝুলিয়ে দিল। কী অপূর্ব তাদের রঙ—গোলাপি, সবুজ, নীল! কেঁপে-কেঁপে একটা পর্দা মিলিয়ে যেতে না-যেতেই আর-একটা পর্দা ভেসে ওঠে আকাশের অন্য প্রান্তে।

অন্ধকার রাতে মাঝে-মাঝে এই কলকাতায় বসেও হঠাৎ যেন সেই আলোর খেলাটা দেখতে পাই। হঠাৎ-হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে টরনেত্র্যাস্ক লেকের ধারে রাঙন গাছের সারি। বরফে-ঢাকা ক্যারকেভাগে উপত্যকার শান্ত, গম্ভীর ছবি। তখন কে যেন প্রশ্ন করে, "ডঃ অ্যানডারসনের মতো বন্দী হয়ে থাকতে চাও আবিস্কোর তুষাররাজ্যে?"

সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে জবাব পাই, "নিশ্চয়ই।"



ন্যুলইয়া পাহাড়ে লেনার্ট ও পথ-প্রদর্শক



বুয়ার অ্যাডভেঞ্চার

মিহির সিংহ

ভারী মজা! বাবাই বললেন, "বুয়াসোনা, তুমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ো, কাল ভোরে উঠে আমরা কলকাতা যাব।" শুনে বুয়া খুব খুশি। সে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর শুয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতে বুয়া দেখল, মামমাম্ স্টোভ জ্বেলে দুধ গরম করছেন, আর বাবাই সব জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িটার মধ্যে সাজিয়ে রাখছেন। গাড়িটা বের করা রয়েছে দেখেই বুয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল. তার ভয় হল, তাকে ফেলেই বোধহয় বাবাই চলে যাবেন। মামমাম্ দুধ নামিয়ে আসতে আসতে বাবাই হাতের জিনিসটা ধপাস করে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ভিতরে এসে বুয়াকে কোলে তুলে নিলেন। বুয়া শক্ত করে বাবাইকে আঁকড়ে ধরে বলল, "না না না না।"

অর্থাৎ আমাকে না নিয়ে যাবে না।

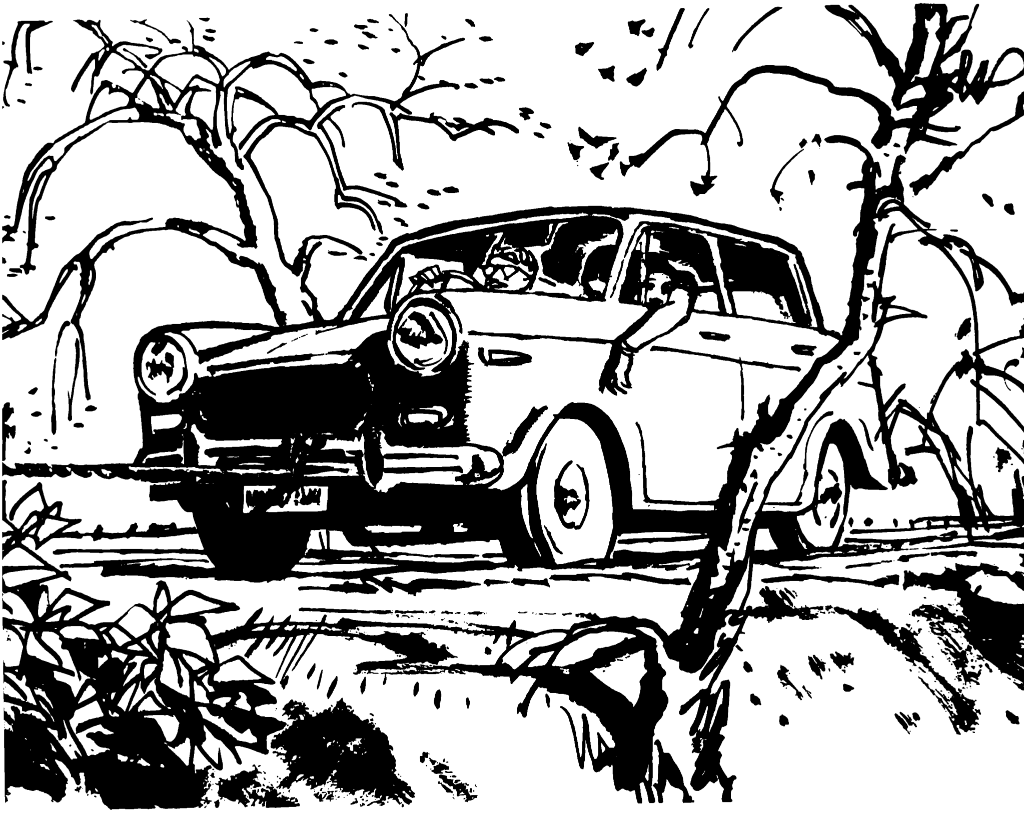
বাবাই কিন্তু বুঝতে পারলেন না। বললেন, "না না কী রে পাগলি?"

বুয়ার অবশ্য এর মধ্যেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সে নাকি গলায় বাবাকেই নকল করে বলল, "পাগলি!"

মামমাম্ সুন্দর ছবি-আঁকা গেলাসে দুধ এনে বললেন, "এটা চট করে খেয়ে নাও।"

বুয়া দুধটা এক চুমুকে খেয়ে নিল। আসলে, বুয়ার তখন খুব ফুর্তি, দুধ খাওয়া হয়ে গেলেই তো রওনা হবে। গাড়ি চড়তে তার খুব ভাল লাগে।

বাবাই যখন ঘরর্র ঘরর্র ঘোঁ। করে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন তখন অল্প আলো ফুটেছে আকাশে। হাওয়া বেশ ঠান্ডা। মিষ্টি-মিষ্টি



গন্ধ আসছে, বোধহয় শিউলি গাছটার দিক থেকে। মামমামকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথায় সেই লাল রুমালটা বেঁধেছেন। বারান্দার আলোতে মনে হল, তাঁর চোখদুটো যেন ছলছল করছে।

বুয়া বসেছিল পিছনের সীটে। সামনের সীট আর পিছনের সীটের মধ্যে যেটুকু জায়গা সেখানে বাবাই যত-রাজ্যের জিনিসপত্র বোঝাই করে বিছানা পেতে দিয়েছিলেন। তারই উপরে বুয়া আর তার রোঁয়াঅলা ভৌ-ভৌ গড়াগড়ি খাচ্ছি। ভৌ-ভৌটার পেট টিপলে প্যাঁক প্যাঁক করে করে ডাকে।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল। কিন্তু, এ কী! রাস্তা-টাস্তা সব অন্ধকার-অন্ধকার এখানে-সেখানে অনেক লোক শুয়ে রয়েছে চাদরমুড়ি দিয়ে। এ কি কারও ভাল লাগে দেখতে? দেখতে দেখতে বুয়ার হাই উঠতে লাগল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল তার ভৌ-ভৌকে জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখে, গাড়ি থেমে গিয়েছে, আর বাবাই দরজা খুলে নামছেন। বুয়া উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মামমাম্?"

বাবাই ততক্ষণে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কী যেন দেখতে শুরু করেছেন। এ-ব্যাপারটা বুয়া খুব জানে। ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা মানেই অনেকক্ষণ দেরি হবে, বাবাই কালিঝুলি মাখবেন, তারপরে রাগ করে খুব বকুনি দেবেন, বোধহয় বেচারা গাড়িটাকেই। আর মামমাম্ গাড়িতে বসে বসে বাবাইকে খুব ঠাট্টা করবেন। কখনও কখনও আবার লোকজন এসে গাড়িটাকে ঠেলেও দেয়। সেও ভারী মজা। বাবাই কালিঝুলি মাখলেও ভারী মজা লাগে। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বাবাই আর মামমাম্ দুজনেই কেমন চুপচাপ করে থাকেন। হাসেন না, বেশি কথা বলেন না,

ঠাট্টা করেন না, বুয়াকে নিয়ে হুটোপাটি করেন না। একেই কি গরিব হয়ে যাওয়া বলে?

আজ মাম্‌মাম্‌ অন্যদিনের মতো বাবাইকে মোটেই ঠাট্টা করলেন না। কেবল নেমে গিয়ে বাবাইয়ের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুয়া খুব চেঁচাতে লাগল, "আমি নামব, আমি নামব।" কিন্তু মাম্‌মাম্‌ রাজি হলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুয়া মাম্‌মাম্‌কে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের গাড়ির কী হয়েছে?"

মাম্‌মাম্‌ বললেন, "আমাদের গাড়িটা তো বুড়ো হয়ে গিয়েছে! তাই ওর মধ্যে-মধ্যে একটু অসুখ করে। আমরা কলকাতায় যাই, তারপর বাবা কাজ পেলে নতুন একটা গাড়ি কেনা হবে।"

কথাটা বুয়ার ভাল লাগল না। বুড়ো তো ভাল। দাদাই ভাল, দিদাই ভাল, এমন সুন্দর বুড়ো গাড়িটাও ভাল। তবু ঘাড় নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। বাবাই যেমন করেন তেমনি করে ইঞ্জিনের মধ্যে হাত দিয়ে দারুণ জোরে ভরর-ভরর আওয়াজ-টাওয়াজ করে ঘড়াং করে ঢাকনিটা বন্ধ করলেন। আবার গাড়ি চলল।

বুয়া সামনের সীটে হেলান দিয়ে বসে বাইরেটা দেখতে লাগল। এই রকম রাস্তা ওর খুব ভাল লাগে। অনেক গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে অনেক জল। আকাশটা নীল হয়ে সেই জলের মধ্যে পড়েছে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পরে বাবাই বললেন, "কী করি বলো তো? ব্রেকটা ধরছে না। ব্রেক অয়েল পাই কোথায়?"

মাম্‌মাম্‌ মুখ শুকনো করে বসে ছিলেন। বললেন, "তখনি তোমাকে বললাম, থাকগে আমার আংটিটা, যা-যা লাগে গুছিয়ে নাও। এত দূর রাস্তা, হাতে একদম পয়সা নেই। এখন কী করবে?"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কী যে হল, ভয়ানক একটা ধাক্কায় গাড়িটা হেলে পড়ল এক পাশে গিয়ে। বুয়ার মনে হল, কালী-পুজোর বাজির চাইতেও জোরে আওয়াজ করে কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে। ও ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। তারপর দেখল, বাবাই বেয়ে উঠে গাড়ির দরজাটা কোনোমতে খুলে মাম্‌মাম্‌কে টেনে বের করেছেন, আর মাম্‌মাম্‌ চিৎকার করে বলছেন, "বুয়াকে ধরো, বুয়াকে ধরো!"

বুয়াকে ওর বাবাই বের করলেন। বুয়া মাটিতে পা দিয়ে দেখে গাড়িটা কাত হয়ে গেছে। ওপর দিকের চাকা দুটো একটু-একটু ঘুরছে।

রাস্তার ওদিকে একটা লাল রঙের গাড়ি। তার দরজা খুলে খুব লম্বা আর খুব মোটা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলে বাবাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "চোখে দেখতে পান না? এইভাবে ধাক্কা মারলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "গাড়ি! গাড়ি কোথায়? ও তো একটা ক্যানেস্তারা! এই নিন পঞ্চাশটা টাকা, আর একটা কিনে নেবেন।"

এই বলে পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে বাবাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লাল গাড়িটাতে উঠে ভোঁ করে বেরিয়ে গেলেন। বাবাই একেবারে হতভম্ব!

মাম্‌মাম্‌ ঠিক আগেকার মতো রেগে উঠে বললেন, "তুমি কিছু বলতে পারলে না?"

বাবাই একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "কী করি? তোমরা রয়েছ সঙ্গে, ঐ গুণ্ডার সঙ্গে একা আমি কী করি?"

মাম্‌মাম্‌ আর-কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবাই প্রায় নিজের মনেই বললেন, "কী করি এখন? কী করে এখন কলকাতা পৌঁছই, গাড়িটারই বা কী করি? পকেটে তো সাতটা মোটে টাকা!"

বুয়া বুঝেছিল যে, খুব একটা মুশকিল হয়েছে। কিন্তু ও এটাও লক্ষ করেছিল যে, ঐ লাল গাড়ির ভদ্রলোকের ছুঁড়ে-দেওয়া নোটগুলো দলাপাকানো অবস্থায় হাওয়ায় একটু-একটু করে সরে সরে তাদের দিকে আসছিল। ও খপ্‌ করে সেগুলোকে তুলে নিয়ে বাবাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও টাকা।"

বাবাই অন্যমনস্কভাবে সেগুলোর দিকে তাকিয়েই প্রকাণ্ড এক চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এ কী! এ-যে একশো টাকার নোট—এক, দুই, তিন চার পাঁচ—পাঁচশো টাকা!"

মাম্‌মাম্‌ নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "তাই তো! ও লোকটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। বলল তো পঞ্চাশ টাকা।"

এর মধ্যে একটা খালি লরি এসে থেমেছিল। যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি নেমে এসে বললেন, "কী করে হল?"

বাবাই বললেন, "একটা বড় ডজের কীর্তি। সোজা ধাক্কা লাগাল।"

"লাল রঙের?"

"হ্যাঁ।"

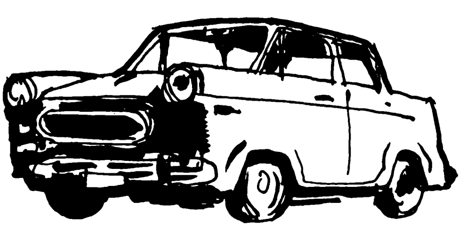
"ওটা সমস্ত রাস্তা আসছে ঐ রকম জ্বালাতন করতে করতে। কিন্তু কী কাণ্ড! বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে—আপনারা যে প্রাণে বেঁচেছেন—"

বাবাই মাম্‌মামের হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "আর এদিকে দেখুন আর এক কাণ্ড। পঞ্চাশ বলে পাঁচশো টাকা ছুঁড়ে দিয়ে গেল! এ নিয়ে এখন কী করি?"

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে বললেন, "করবেন আবার কী, সঙ্গে রাখুন, গাড়িটার হয়তো তেমন কিছু হয়নি, তবু যা সারাই করবার করিয়ে নেবেন। আমি দেখি কুলিরা আপনার গাড়িটাকে সোজা করতে পারে কি না।"

লরির কুলিরা, ঐ ভদ্রলোক আর বাবাই মিলে ওলটানো গাড়িটাকে সোজা করল। ঐ লরির পেছনে গাড়িটাকে বেঁধে দেওয়া হল। এখন বুয়া খুশি, সবাই খুশি।

বুয়াদের গাড়ির ইঞ্জিন চলছে না, বাবাই তবু স্টীয়ারিং ধরে বসে রইলেন। তারপরে মাম্‌মাম্‌ বুয়াকে কোলে নিয়ে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোঁ-ভোঁ একলা পড়ে রইল পেছনের সীটে। বুয়ার খিদে পেয়ে গেলেও বেশ মজা লাগতে লাগল।



(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবু আর সন্তু এবার এসেছে হিমালয়ে এভারেস্ট-চূড়ার দিকে এক অভি-যানে। কালাপাথর নামে একটা পাহাড়ের কাছে ইয়েতির মতো এক বিশাল প্রাণীকে দেখে ভয় পেয়ে শেরপা আর মালবাহকরা পালিয়ে যায়। কাকাবাবুর কাছ থেকে ওয়্যারলেসে খবর পেয়ে দু-জন সামরিক অফিসার এলেন ওঁদের সাহায্য করতে। ওঁরা সকলে মিলে আবার এগোচ্ছিলেন, এমন সময় কাকাবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বরফের ওপর পড়ে আছে তাঁর একটি ক্রাচ আর রক্ত। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া গেল না। ....কাকাবাবু জ্ঞান ফেরার পর দেখলেন, তিনি একটি গুহার মধ্যে। বাঁদরের মতন একটা বড় প্রাণী তাঁকে মারবার জন্য এগিয়ে আসছে। কাকাবাবু রিভলভার বার করে গুলি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গুলি বেরুল না। তারপর—

॥ ১৬ ॥

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে—দুপুর-বেলা তাঁর রিভলভারে গুলিভরা ছিল। কিন্তু এখন ওটার মধ্যে একটাও গুলি নেই। কেউ গুলি বার করে নিয়েছে।

বাঁদরের মতন প্রাণীটা খুব কাছে এগিয়ে এসেছে বলে কাকাবাবু প্রাণপণ শক্তিতে খালি রিভলভারটাই ছুঁড়ে মারলেন প্রাণীটার মাথা লক্ষ করে।

সেটা লাগলে নিশ্চয়ই প্রাণীটার মাথা ফেটে যেত। কিন্তু প্রাণীটা তার আগেই চট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে খুব কায়দা করে লুফে নিল রিভলভারটা। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীভৎস ভাবে হাসির মতন শব্দ করল।

কাকাবাবু কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। তারপর তিনিও খুব জোরে হেসে উঠলেন হো-হো করে।

জন্তুটা কাকাবাবুর হাসি শুনে যেন একটু চমকে গেল। কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা। জন্তুটা কাকাবাবুর দিকে চেয়ে মাথা দোলাতে লাগল একটু একটু। তারপর আবার একটা বিকট শব্দ করে দু'হাত উঁচু করে কাকাবাবুর গলা টিপে দেবার জন্য এগোতে লাগল।

কাকাবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জন্তুটা খুব কাছে আসতেই তিনি নিজেই আগে খপ করে চেপে ধরলেন ওর এক হাত। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন।

কাকাবাবুর একটা পা দুর্বল, কিন্তু তাঁর দু'হাতে অসুরের মতন শক্তি। সেই হ্যাঁচকা টানে টাল সামলাতে না পেরে সেটা একেবারে কাকাবাবুর গায়ের ওপরে এসে পড়ল। কাকাবাবু প্রবল শক্তিতে জন্তুটাকে তুলে একটা আছাড় মারতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই জন্তুটা কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আর ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ভয়ংকরভাবে।

কাকাবাবুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়ু আর মিঃ কেইন শিপটন, আই প্রিজিউম ?"

জন্তুটা আওয়াজ করে থামল। তারপর সেও ইংরেজিতে উত্তর দিল, "ইউ আর রঙ, মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যেই হোন, দয়া করে ঐ মুখোশ আর ধড়াচূড়াগুলো খুলে ফেলবেন! তা হলে কথা বলার সুবিধে হয়।"

লোকটি মাথার পেছন দিকে হাত দিয়ে কিছু করতেই বাঁদর কিংবা ইয়েতির মুখোশটা খুব সহজেই খুলে গেল। কিন্তু তখনো লোকটির মুখে আর-একটি মুখোশ। একটা হলদে রঙের পলিথিন বা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর মুখোশ মুখের সঙ্গে সাঁটা। চোখে চশমা, কিন্তু তার কাচ দুটো রুপোর মতন ঝকঝকে। লোকটির পোশাকের রংও হলদে, আর খুব টাইট পোশাক। লোকটি খুব বেশি লম্বা নয়। কিন্তু বাঁদরের চামড়ার মধ্যে তাকে বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল, সম্ভবত উঁচু জুতোর জন্য।

কাকাবাবু মুখে খানিকটা বিরক্তির ভাব এনে বললেন, "এরকম অদ্ভুত পোশাকের মানে কী? আপনি বুঝি মুখ দেখাতে চান না?"

লোকটি কোনো উত্তর দিল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "একটা বাঁদরের পোশাক পরে ইয়েতি সেজে আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন ? আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন? আমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন আপনি বা অন্য কেউ আমার রিভলভার থেকে গুলি বার করে নিয়েছেন, সেটাও আমাকে ঠকাবার জন্য, তাই না?"

লোকটি কোমরে দু'হাত দিয়ে চুপ করে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাকাবাবু এবার বেশ কড়া গলায় বললেন, "আমাকে এখানে জোর করে ধরে আনা হয়েছে কেন? আপনি কে?"

লোকটি এবার ছোট করে একটু হাসল। তারপর বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে, আমিই আপনার হাতে ধরা পড়েছি। আর আপনি আমার জেরা করছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় কেন ধরে এনেছেন, তা জিজ্ঞেস করব না? আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?"

লোকটি বলল, "আপনি বিখ্যাত লোক, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনার নাম অনেকেই জানে।"

লোকটি পকেট থেকে একটি ছোট্ট রুপোলি রঙের রিভলভার বার করে খেলা করার মতন দু' তিনবার লোফালুফি করল। তারপর হঠাৎ সেটা সোজা উঁচিয়ে ধরল কাকাবাবুর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, এটাতে কিন্তু গুলি ভরা আছে। আর এর একটার বেশি গুলি খরচ করতে হয় না।"

কাকাবাবু একটুও ভয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটি ট্রিগারে আঙুল রেখে বলতে লাগল, "ওয়ান, টু, থ্রি..."

কাকাবাবু আবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললেন; "কেন এরকম ছেলেমানুষির মতন ব্যাপার করছেন বারবার? আপনি কি ভাবছেন, এইভাবে ভয় দেখিয়ে আমায় কাবু করবেন? মৃত্যুভয় থাকলে কেউ খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চড়তে আসে?"

এইসময় দূরে আবার সেই মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। কেউ ইংরেজিতে কতকগুলো অক্ষর আর সংখ্যা বললে।

লোকটি মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর রিভলভারটা নামিয়ে বলল, "সত্যিই, এরকম ভাবে আপনাকে ভয় দেখানো যাবে না। তাছাড়া ভয় পাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মুখে তার ছাপ পড়ে। আপনাকে আমরা খুব ভদ্রভাবে, আস্তে আস্তে, অনেক সময় নিয়ে, মেরে ফেলব।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "আপনারা আমাকে খুন করবেন?"

লোকটি বলল, "তাছাড়া আর উপায় কী, বলুন? আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন।"

"আমাকে খুন করা শক্ত। এর আগে অনেকে চেষ্টা করেছে। কেউ তো পারেনি।"

"আমি দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী, এখান থেকে জীবিত অবস্থায় বেরুবার সত্যিই কোনো উপায় নেই আপনার। আপনি বেশি কৌতূহল না দেখালে আপনাকে এভাবে মরতে হত না।"

"আমাকে যদি মারতেই হয়, তাহলে শুধু শুধু দেরি করছেন কেন? আর এত কথাই বা বলছেন কেন?"

"জানেন তো, খুব ভয় পেলে অনেকে হার্টফেইল করে। ভয় দেখিয়ে আপনাকে মেরে ফেলতে আমাদের অনেক সুবিধে হত।"

"ভয় দেখিয়ে মানুষ মারাই যদি আপনার শখ হয়, তাহলে আপনি বা আপনারা ভুল লোককে বেছেছেন।"

"হা-হা-হা, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি খুব চালাকের মতন কথা বলেন। আপনার সত্যিই মনের জোর আছে। আপনাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা হচ্ছে না, তার কারণ, আপনি জানেন কি, মৃতদেহও কথা বলে?"

"কী?"

"মনে করুন, আপনাকে গুলি করে কিংবা মাথায় ডান্ডা মেরে কিংবা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হল। তারপর আপনার মৃত-দেহটা নিয়ে কী করা হবে। বুঝতেই পারছেন, এটা—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "দেখুন ক্রাচ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে আমার একটু অসুবিধে হয়। আমি একটু বসতে পারি কি?"

তারপর কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপর বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে পাইপটা বার করলেন। কিন্তু পাইপের তামাক যে পাউচটায় থাকে, সেটা পেলেন না। অন্য পকেটগুলো হাতড়েও দেখলেন, তামাকের পাউচটা নেই।

লোকটি বলল, "দুঃখিত, এখানে ধূম-পান নিষেধ। সেই জন্যই আপনার পকেট থেকে তামাকটা বার করে নেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু শুধু পাইপটাই দাঁতে কামড়ে ধরে খুব শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, তারপর বলুন, আমার মৃতদেহটা নিয়ে কী করা হবে?"

লোকটি বলল, "বুঝতেই পারছেন, এই জায়গাটা মাটির নীচে। সেইজন্যই এখানে ধূমপান চলে না। আপনার মৃতদেহটা এখানে রাখা যাবে না, কারণ পচে গিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরুবে। সেইজন্য আপনার মৃতদেহটা ওপরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। একদিন-না-একদিন কেউ সেটা খুঁজে পাবেই। ওপরে ঠান্ডায় বরফের মধ্যে মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় না। কেউ খুঁজে পাবার পরই আপনার মৃতদেহ কথা বলে উঠবে।"

কাকাবাবু বললেন, "অর্থাৎ আমার



মৃতদেহটি পোস্ট মর্টেম করলেই ধরা পড়ে যাবে যে কীভাবে আমায় মারা হয়েছে। বিষ খাইয়ে, নয় গুলি করে। না মাথায় হাতুড়ি মেরে।"

"ঠিক তাই। আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে বেশি বোঝাতে হয় না। ঐরকম অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু দেখলেই সরকারের সন্দেহ হবে, তখন এই জায়গাটায় খোঁড়াখুঁড়ি বাড়বে। আমরা এখানে বেশি লোকজনের আসা-যাওয়া পছন্দ করি না। সেইজন্যই স্বাভাবিক মৃত্যুই সবচেয়ে সুবিধাজনক। দু'তিনমাস বাদে আপনার স্বাভাবিক মৃতদেহটা যদি কেউ খুঁজে পায়, যাতে আপনাকে খুন করার কোনো চিহ্ন নেই, তাহলে আর কেউ কোনো সন্দেহ করবে না। ভাববে, আপনি পাহাড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। কী, ঠিক নয়?"

"হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দিন তো! আমি স্বাভাবিকভাবে দু'তিনমাসের মধ্যে মরতে যাব কেন? আমার তো আরো অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে!"

"হা-হা-হা! বাঁচতে কে না চায়! আপনিও নিশ্চয়ই আরও তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঁচতে পারতেন, যদি আপনি কলকাতায় থাকতেন, কিংবা দার্জিলিং বেড়াতে যেতেন কিংবা আর-কিছু করতেন। এখানে এসে আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে কে বলেছিল? কেনই বা আপনি গম্বুজটার ওপরে রাত জেগে চোখে দুরবিন এঁটে বসে থাকতেন?"

"হুঁ, আমার সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছুই জানেন দেখছি। আমার পেছনে আপনারা কোনো চর লাগিয়েছিলেন। কিংবা আমি ওয়্যারলেসে যে খবর পাঠাতাম, সেটা আপনারাও শুনে ফেলেছেন। কিন্তু যাই বলুন, দু' তিনমাসের মধ্যে আমার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর কোনোই আশা নেই।"

"আছে, আছে, মিঃ রায়চৌধুরী, আছে। আপনাদের দেশ এই ইণ্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি লোক খুব স্বাভাবিকভাবে কেন মরে বলুন তো?"

"এবার বুঝলাম। আপনারা আমাকে না

শালিক

বিশ্বপ্রিয়

একটা শালিক,
বেশ অমায়িক—
একলা যখন থাকে।
বাঁধলে ও জোট
পাকায় না ঘোঁট,
মেজাজ শরিফ রাখে।
কিন্তু যেই তিনটি হয়,
অমনি হঠাৎ কী বিস্ময়!
ক্যাঁচোর-ম্যাচোর
হাঁক তুলে জোর
লাফায় এ ওর ঘাড়ে,
তখন খুকুর
ঘুমের দুপুর ঃ
একবারে চোখ ছাড়ে।

খাইয়ে মারতে চান।"

"না, না, না, না— একেবারে না-খাইয়ে নয়। কিছু খেতে দেব। আপনাদের দেশের বেশিরভাগ লোকেই শুধু একবেলা খায়। আপনিও একবেলা খেতে পাবেন। দু'খানা টোস্ট। একটি পাঁচবছরের শিশুকে যদি শুধু দু'খানা টোস্ট খাইয়ে রাখা যায়, তা হলে সে তিনমাসের বেশি বাঁচে না। আপনার মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ দেড়মাস দু'মাসের বেশি পারবেন না।"

"যে চীনা ভদ্রলোকটিকে আপনারা গম্বুজের দরজার পাশে রেখে এসেছিলেন, তাকেও ঐভাবেই মেরেছেন?"

"ওরে বাবা, ঐ চীনা ভদ্রলোক এক অদ্ভুত মানুষ। আপনি বিশ্বাস করবেন কি, মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে উনি আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন। অতি নিরীহ, শান্তশিষ্ট ভালমানুষ, কখনো গোলমাল করতেন না। আমরা ওঁকে পছন্দই করতাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁকে আমরা কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে পারি না—"

"আশ্চর্য!"

"সত্যি আশ্চর্য নয়? মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে আড়াই বছর..."

"তা তো বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনারা আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছেন?"

"আমরা ঠিক কতদিন এখানে আছি, আন্দাজ করুন তো?"

কাকাবাবু দাঁত দিয়ে পাইপটাকে কামড়াচ্ছিলেন। এবার সেটাকে মুখ থেকে নামিয়ে ফেললেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় পাইপের ধোঁয়া না টানলে তাঁর চলে না। তিনি পাইপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললেন, আজ থেকে পাইপ টানা ছেড়ে দিলাম। কলকাতার বাড়িতে যে আট-ন'টা পাইপ আছে,সেগুলোও অন্য লোকদের দিয়ে দেব।

কুকুরটা খানিক আগে চলে গিয়েছিল, এই সময় আবার ফিরে এল। এবার কিন্তু সে আর কামড়াবার চেষ্টা করল না কাকাবাবুকে। কুঁইকুঁই করে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কাকাবাবু আস্তে করে তার মাথা চাপড়ে দিলেন, কুকুরটা সরে গেল না।

মুখোশ-পরা লোকটি বলল, "আপনি খোঁড়া বলেই আপনাকে বেঁধে রাখা হয়নি, আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আপনার পক্ষে বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল। আপনাকে বিছানা পাঠিয়ে দেব, শুয়ে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমার বিছানায় দুটো বালিশ লাগে।"

"ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে নেই। রবারের বালিশ, সেটা ফুলিয়ে আপনি যত ইচ্ছে উঁচু করে নেবেন। আর কিছু?"

"এই কুকুরটা আমার গ্লাভস চুরি করে নিয়ে গেছে।"

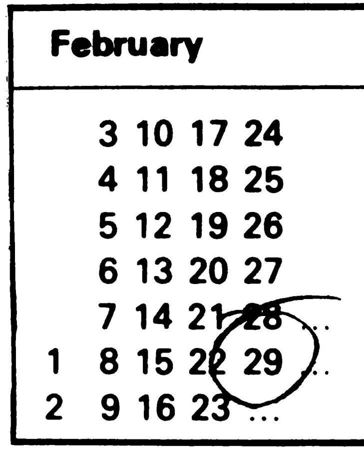
"ফেরত পাবেন। আর...ইয়ে, আপনার টোস্ট দু'খানি কি আপনি কড়া চান, না নরম ভাবে সেঁকা?"

কাকাবাবু এক মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারলেন লোকটির মুখের ওপর। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় চোখের নিমেষে সামনে ঝুঁকে পড়ে লোকটির একটা পা ধরে মারলেন এক হ্যাঁচকা টান।

তাল সামলাতে না পেরে লোকটি দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। (ক্রমশ)

২৯ ফেব্রুয়ারির রহস্য

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিনের থেকেও কয়েক ঘণ্টা বেশি। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে প্রতি বছরে ৩৬৫ দিনের পরেও ¼ দিন বাড়তি থেকে যায়। এই বাড়তি সময়টা যদি বছর-বছর জমা হতে থাকে এবং বছরের আয়তনের মধ্যে এই সময়টার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে না রাখা হয়, তাহলে একটা দারুণ সমস্যা দেখা দেবে। লীপ ইয়ার বা অধিবর্ষ চালু হওয়ার আগে এরকম একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে। বছরের পর বছর এই ¼ দিন নিয়ে মাথা না ঘামানোর ফলে মার্চ মাসের ক্যালেণ্ডারের সময় ১০ দিন এগিয়ে গেল। সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বছরে দুবার—২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে। এই দুটি দিনকে বলা হয় মহাবিষুব ও জলবিষুব। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে সময় ১০ দিন এগিয়ে যাওয়ার ফলে মহাবিষুবের তারিখ পড়ল ২১ মার্চের বদলে ১১ মার্চ। তখন পোপ গ্রেগরি ত্রয়োদশ ক্যালেণ্ডার থেকে ১০ দিন সময় কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এর ফলে ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবরের বৃহস্পতিবারের পরের তারিখটি হল শুক্রবার ১৫ অক্টোবর। গ্রেগরি আরও নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি ৪০০ বছরে ক্যালেণ্ডার থেকে ৩ দিন বাদ দিতে হবে। ঠিক করা হল যে, শেষে দুটি শূন্য থাকলেই তাকে অধিবর্ষ বলা হবে না যদি-না আগের দুটি সংখ্যাকে ৪ দিয়ে ভাগ করা যায়। এই হিসেবে ১৬০০, ২০০০ প্রভৃতি বছরগুলি অধিবর্ষ হবে কিন্তু ১৭০০, ১৯০০ প্রভৃতি বছর অধিবর্ষ হবে না। এইভাবে হিসেব করলেও ক্যালেণ্ডারে কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে। কারণ এই ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বছরে দিনের সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫·২৪২৫ দিন। কিন্তু আসলে এই সময়ের হিসেবটা সৌরবর্ষের সময় থেকে ০·০০০৩ দিন বেশি। এর ফলে প্রতি ১০,০০০ বছরে সময়ের হেরফের হবে তিন দিন। এখন প্রতিটি দেশই এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার মেনে নিয়েছে।

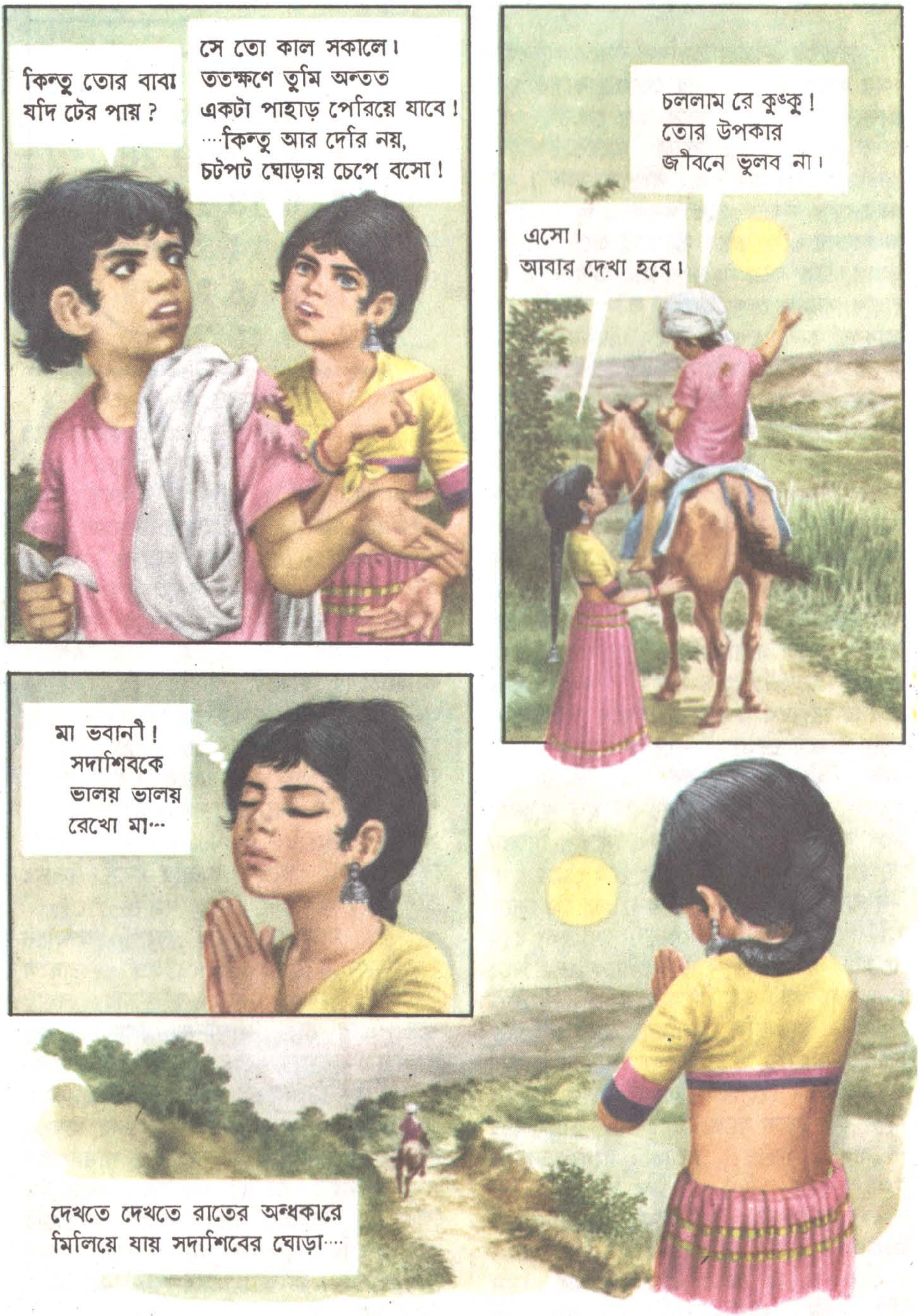


এখন প্রতি চতুর্থ বছরেই ক্যালেণ্ডারে ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন বেশি থাকে। এই বছরগুলিকেই লীপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলা হয়। এই বছরগুলিতে ফেব্রুয়ারি মাসে ২৮ তারিখের বদলে ২৯ তারিখ পর্যন্ত থাকে। ৩৬৫ দিনকে এক বছর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর প্রায় ¼ দিন যে বাড়তি সময়টা থেকে যায়, সেটাকে ক্যালেণ্ডারে ও তারিখের হিসেবে জায়গা করে দেওয়ার জন্যেই এই অধিবর্ষের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ প্রতি বছর প্রায় ¼ দিন বাড়তি সময় থাকলে ৪ বছরে সেই সময়টা পুরো একটা দিনের সমান হয়ে যাবে। ১৯৮০ সালও এই রকম একটা অধিবর্ষ। সেইজন্যে এই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের সংখ্যা ২৮-এর বদলে হল ২৯।

এখন মনে করো, যদি কারুর জন্মদিন ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে হয় তাহলে তার কী অবস্থা হবে। প্রতি চার বছরে ক্যালেণ্ডারে তার জন্মদিন আসবে মাত্র একবার। যেমন ধরো, আমাদের দেশের মোরারজি দেশাই। তিনিও জন্মেছেন ২৯ ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্তম হেনরি তাঁর শাসনকালে এমন আইন তৈরি করলেন, যাতে ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে যারা জন্মাবে তাদের জন্ম - তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি বলে মেনে নেওয়া হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই নীতি মেনে চলা হয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সদাশিব আদিকাণ্ড

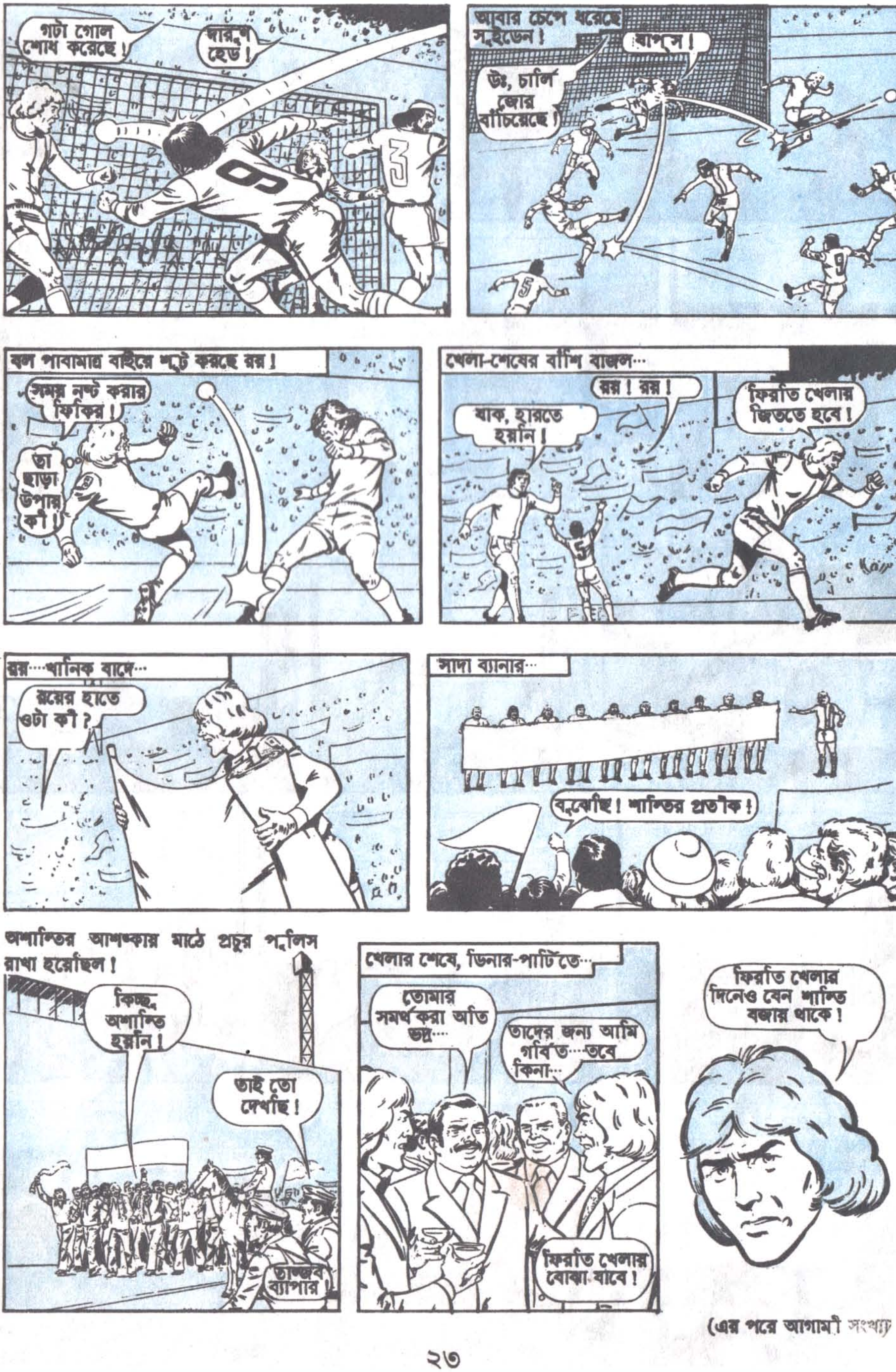
চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ





(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
ইচ্ছে করে তুমি মাথা তাক করে বল মেরেছ!
এই রে, গটা কি রয়কে মারবে নাকি?
আমাদের সমর্থকরা তাহলে খেপে যাবে।
মাঠে দাঙ্গা শুরু হবে।
কী হচ্ছে এসব?
রয় কিন্তু শান্ত····
তুমি আমার প্রশংসা করছ বুঝি?
অ্যাঁ?
আমিও তোমার খেলা দেখে খুব খুশি!
কী ব্যাপার?
এক মুহূর্তের স্তব্ধতার পরে···
রয় সত্যি দারুণ বুদ্ধিমান!
যাক, সবাই হাসছে।
হাসছে সুইডিশ খেলোয়াড়রাও···
মাথায় চোট পাওনি তো?
একটু-আধটু লেগেই থাকে!
খেলা শুরু হোক!
তারপর···
এই রে, গোল না দেয়!
সুইডেন চেপে ধরেছে!



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

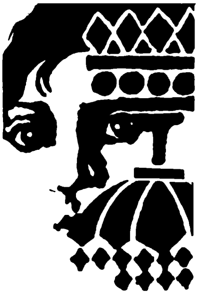

১২ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত যত জাহাজ ছেড়েছে, তাদের ক্যাপ্টেনদের এক্ষুনি···· বেতারে আপনার বন্ধুর বর্ণনা পাঠাচ্ছি।
ধন্যবাদ ইনস্পেকটর।
কাজ কি বিশেষ এগোচ্ছে ?
ধুত!
ওই জাহাজটা দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে। ওর মধ্যে নেই তো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই সম্ভব! আরে, ও কে!
কে তুমি ?
পুলিস!
হ্যাল্লো জেনারেল!
আরে, টিনটিন!
কোথায় চললেন ?
নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি। এখানে তো সঙ্গী পাচ্ছি না।
কেন, চিকিটোর কী হল ?
আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। চারদিন আগে···
চারদিন আগে ? তার মানে বারো তারিখে! আচ্ছা জেনারেল চিকিটো কি সত্যি রেড-ইন্ডিয়ান ?
নিশ্চয়! ও হচ্ছে ইনকাদের শেষ বংশধর!
বলেন কী ?
ঠিক বলছি। ওর আসল নাম হল রুপাক ইনকা হুয়াকো!
অর্থাৎ সেই গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারের পাশে যে বসে ছিল····
গাড়ির মধ্যে ?
আচ্ছা, চিকিটোর কি এমন একজন গোঁফওয়ালা মোটা বন্ধু ছিল, যে চশমা পরত ?
কই, কখনো তো দেখিনি!
ভো—ও—ও—ও
তাহলে চলি টিনটিন। পরে আবার দেখা হবে।
ধন্যবাদ!
উঠে পড়ুন!


কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?
জেনারেল আলকাজার।
দুটো অদ্ভুত খবর শুনলাম। প্রথমত, বারো তারিখ থেকে চিকিটো নিরুদ্দেশ। সেই রাত্রেই তারাগঁ আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরদিন থেকে ক্যালকুলাস নিখোঁজ।
দ্বিতীয়ত, চিকিটোর আসল নাম হল রুপাক ইনকা হুয়াকো। সে হচ্ছে ইনকাদের বংশধর।
বলো কী ?
যোগা-যোগটা কি নেহাতই কাক-তালীয় ?
আরে, এ কী !
?
এক্ষুনি নামিয়ে দাও আমাকে ! এক্ষুনি !
পাজি ! গণ্ডার ! হনুমান !
কিন্তু ক্যাপ্টেন…
উল্লুক ! হিপোপটেমাস !
এসো ক্যাপ্টেন !
ইনস্পেক্টরকে সব কথা জানাতে হবে !
হুম ! দেখি, চিকিটোর সন্ধান মেলে কিনা !… হুম ! মনে হচ্ছে, সে এর সঙ্গে জড়িত !
এবার কী করা যায় ক্যাপ্টেন ?
তাই তো ভাবছি !
রোসো, এক কাজ করলে হয় !
কী ?

(এর পরে আগামী



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে ঃ জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিসের-হাতে-আটক বেহুঁশ ছেলেটিকেই জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে হাসপাতাল-পালানো স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। চান্দোলির সূর্যনারায়ণ জয়রামবাবুর পুরনো বন্ধু ; ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। চন্দ্রভানুও হারানো-জোতির খোঁজে জয়রামবাবুর বাড়ির উপরে নজর রাখছেন। তারপর—

॥ ১৩ ॥

ওদিকে হোটেলের ভেতরে চন্দ্রভানুবাবুর ঘুম নেই। তিনি তখন নিজের ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছেন।

মতিহারি থেকে এসে প্রায় এক মাস হয়ে গেল। রোজই তিনি সন্ধেবেলার দিকে দাদার বাড়ির কাছে গিয়েছেন আর সেই একই দৃশ্য দেখেছেন। একদিনের জন্যেও আর জ্যোতিকে একলা পাননি। দাদা তাকে আর বাড়ির বাইরে যেতেই দেয় না। তিনি খবর নিয়ে দেখেছেন যে, জ্যোতিকে স্কুলেও ভর্তি করা হয়নি।

সেদিন তিনি হোটেল থেকে বেরোলেন। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে পৌঁছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন।

ট্রাম-রাস্তা ছেড়ে তিনি একটা গলি-রাস্তা ধরলেন।

গলির ভেতরে খুব ভিড়। অনেক লোক যাতায়াত করছে। কত রকমের দোকান। তার মধ্যে চীনেম্যানদের দোকানই বেশি। ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে তিনি চলতে লাগলেন সোজা উত্তর দিকে। এ-সব রাস্তা তাঁর চেনা।

বহুকাল আগে যখন তিনি বুলবুলচণ্ডীর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তখন এই পাড়াতেই একটা ঘরে থাকতেন।

সে-সব বহুকাল আগের কথা। বড় কষ্টে তখন তাঁর দিন কেটেছে। এক-একদিন খেতেই পাননি। কতদিন টেরেটি-বাজারে গিয়ে কুলির কাজ করেছেন। এ-দোকান থেকে মাথায় মোট বয়ে নিয়ে গিয়ে হয়তো মাত্র চার আনা পয়সা পেয়েছেন। চার আনা পয়সাতেই যা সামান্য কিছু কিনতে পাওয়া যায় তাই খেয়ে পেট ভরিয়েছেন।

সেদিন সেখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই সব দিনের কথা মনে পড়তে লাগল তাঁর।

এক বুড়ি তাঁকে বড় ভালবাসত। নাম রশিদা-বিবি। বুড়ির কেউ ছিল না।

রশিদা-বিবি বলত, "কী হয়েছে বেটা, আজকে ক' পয়সা আমদানি হয়েছে?"

চন্দ্রভানুবাবু বলতেন, "আজ একটা পয়সাও আমদানি হয়নি—"

রশিদা-বিবি বলত, "তা আজ কী খাবি?"

চন্দ্রভানুবাবু বলতেন, "আজ কিছুই খাব না।"

"কিছু না খেলে বাঁচবি কী করে?"

চন্দ্রভানুবাবু বলতেন, "আমি কতদিন না-খেয়ে থেকেছি, তবু তো মরিনি। এখনও তো বেঁচে রয়েছি।"

রশিদা-বিবির সংসারে কেউ ছিল না। বস্তিবাড়ির একটা ঘরে থাকত। আর বাকি ঘরখানা ভাড়া দিয়ে যা দশ-পনেরো টাকা আসত তাই দিয়েই নিজের খরচা চালাত। তারপর ছিল ঘুঁটে দেওয়া। রাস্তায় রাস্তায় যা গোবর কুড়িয়ে পেত তাই ঝুড়িতে ভর্তি করে এর-ওর বাড়ির ভাঙা ইট-বার-করা দেওয়ালে ঘুঁটে দিত। সেই ঘুঁটে বিক্রি করেও কিছু পয়সা আমদানি হত।

অনেকদিন চন্দ্রভানুবাবুও গোবর কুড়িয়ে এনে দিতেন বুড়িকে। বুড়ির শরীরে যখন কুলোত না তখন চন্দ্রভানুবাবুই সেই গোবর দিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেন।

রশিদা-বিবির স্বামী ছিল না, ছেলে-মেয়ে কিছুই ছিল না। চন্দ্রভানুবাবুকে তাই বুড়ি নিজের ছেলের মতো ভালবাসত।

রশিদা-বিবি বলত, "তুই আমার আগের জন্মের ছেলে রে বেটা। আমায় দেখবার কেউ নেই তাই খোদা তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছে।"

চন্দ্রভানুবাবু বলতেন, ''তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই মা। তুমিই আমার মা।''

রশিদা-বিবি নিজের ভাত থেকে অর্ধেক দিয়ে দিত চন্দ্রভানুবাবুকে। দু'জনেই এক থালাতে খেত। দুঃখী মানুষদের বোধহয় কোনও জাত নেই। পৃথিবীতে বোধহয় দুটো জাতই আছে কেবল। একটা জাত বড়লোক, আর-একটা জাত গরিব।

এতদিন পরে সেই টেরেটি-বাজারের বস্তির কথা মনে পড়তেই সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল তাঁর।

অনেক রাস্তা মাড়িয়ে চন্দ্রভানুবাবু সেই বস্তির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কোথায় সেই বস্তি? সব তো বদলে গিয়েছে। জায়গাটির আর কিছুই চেনা যায় না। কত বড় বড় পাকাবাড়ি হয়ে গেছে সেখানে।

সামনের উলটো দিকের রাস্তার ওপর সেই হোটেলটা চিনতে পারলেন চন্দ্রভানুবাবু। তখন অনেকদিন ওইখানে দশ পয়সা খরচ করে পেট ভরে ভাত আর মাংস খেয়েছেন।

হোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চন্দ্রভানুবাবু। সাদা পাকা দাড়িওয়ালা এক মিঞাসাহেব হোটেলটা চালাত।

হোটেলের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''আচ্ছা মিঞাসাহেব, এখানে রশিদা-বিবি বলে একজন বুড়ি থাকত, সে কোথায় বলতে পারেন?''

মিঞাসাহেব বললে, "রশিদা-বিবি বলে তো কেউ ছিল না।"

একজন থুথুড়ো বুড়োমানুষ লাঠি ধরে ধরে যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। তার কানে বোধহয় কথাটা গিয়েছিল। সে বললে, "রশিদা-বিবি, সেই যে দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুঁটে দিত?"

"হ্যাঁ।"

"সে তো অনেক সাল পহেলে মরে গিয়েছে জনাব।"

"মারা গেছে?"

"হ্যাঁ জনাব, শেষকালে বুড়ি খুব নাজেহাল হয়েছিল। একদিন বস্তির লোক হঠাৎ দেখলে বুড়ি নিজের ঘরের ভেতর মরে পড়ে আছে।"

চন্দ্রভানুবাবুর কথাটা শুনে বড় কষ্ট হল। সে কি আজকের কথা! সেদিন কলকাতায় সেই রশিদা-বিবি যদি চন্দ্রভানুবাবুকে আশ্রয় না দিত, নিজের খাবার থেকে তাঁকে না খাওয়াত, তাহলে আজ তিনি যা হয়েছেন তা কি হতে পারতেন! মনে মনে চন্দ্রভানুবাবু তাঁর সেই 'মা'কে আন্তরিক সম্মান জানালেন। সংসার মানেই বোধহয় এই। একদিন চন্দ্রভানুবাবুকেও সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে। একদল যাবে, আবার আর একদল আসবে। এ নিয়ে দুঃখ কিংবা দুশ্চিন্তা করলে চলবে না।

রাস্তা দিয়ে আর একজন যাচ্ছিল। এ লোকটারও অনেক বয়েস হয়েছে। মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগল। চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "বড়ে-মিঞা না?"

লোকটা থমকে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কে সাহাব?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমাকে চিনতে পারছেন না বড়েমিঞাসাহেব? আমি ভানু।"

"ভানু?"

তবু যেন বড়েমিঞাসাহেব চিনতে পারলে না।

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "আমাকে চিনতে পারলে না বড়েমিঞাসাহেব? আমি এখানে মুটে-মজুরের কাজ করতুম, আর রশিদা-বিবির কাছে থাকতুম।"

তখন যেন লোকটার খেয়াল হল। যেন চিনতে পারলে তাঁকে।

বললে, "ও, আপনি সেই ভানু?" রশিদা-বিবি যাকে নিজের লেড়কার মতো পেয়ার করত! তা আপনি তো অনেক বড় হয়ে গেছেন জনাব।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তা বড় হব না। বয়েস কি কারো জন্যে আটকে থাকে? সে ঠিক তার নিজের নিয়মে বেড়ে চলে।"

"তা তো বেড়ে চলবেই হুজুর। আমারও তো বয়েস বাড়ছে। আজকাল চোখের নজরও কমে এসেছে। অথচ চশমা কেনবার, ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। তা এত সাল পরে আপনি এখানে কী করতে?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "এই তোমাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।"

বড়েমিঞা বললে, "আপনার কিছু সেবা করতে হয় তো বলুন। গরিব সব বন্দোবস্ত করে দেবে।"

"আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে

তুমি বড়েমিঞা ?"

"কী কাজ বলুন ?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "একজন জওয়ান লোক চাই আমার।"

"জওয়ান লোক তো অনেক আছে এ-পাড়ায়। কী কাজ অপনার বলুন না !"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "বড় হুঁশিয়ারির কাজ। যাকে-তাকে দিয়ে হবে না।"

"চুরি-ডাকাতির কাজ ?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"ও-সব কাজ আগে অনেক করেছি। লেকিন আজকাল তো বয়েস হয়ে গিয়েছে, আর ও-সব কাজ আমার শরীরে কুলোয় না। তবে লোক আছে আমার হাতে।"

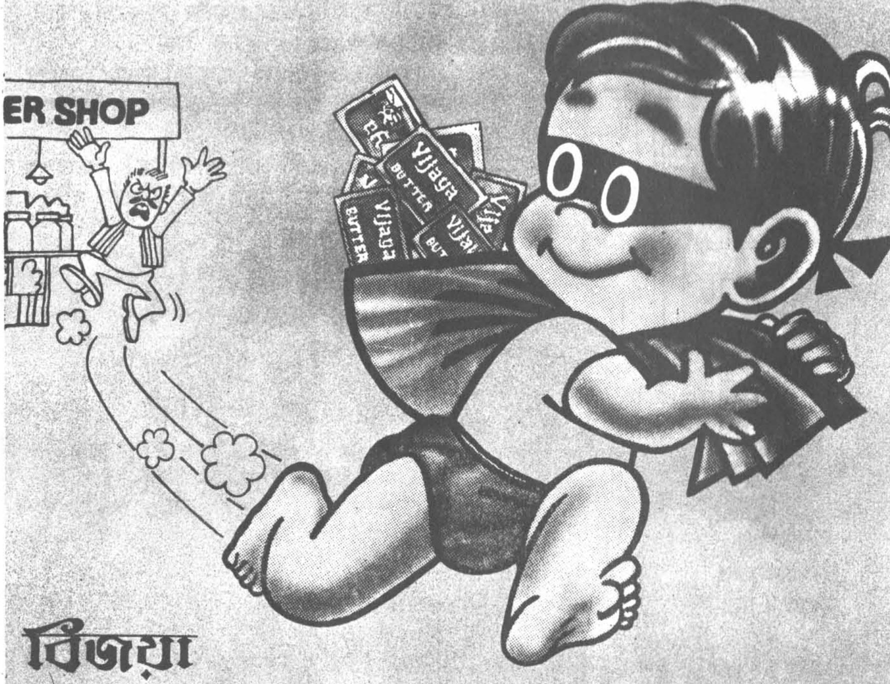
চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "কাজটা খুব শক্ত কাজ। কিন্তু খুব লুকিয়ে করতে হবে। যাতে কেউ জানতে না পারে। আমি সে-কাজের জন্যে অনেক টাকা দেব। অনেক টাকা।"

বড়েমিঞা বললে, "চলুন, আমার সঙ্গে চলুন, আমি লোক দিচ্ছি—আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসুন।।"

বলে এগিয়ে চলতে লাগল। তারপর এ-গলি ও-গলি ঘুরে আর-একটা বস্তির



আবার এল মাখন চোর



বিজয়া
পাস্তুরাইজড
মাখন

দেখলেই জিভে জল আসে!

পাতে খাওয়ার মাখনের দুনিয়ায় বিজয়া মাখনই হল বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মাখন পাস্তুরাইজড, স্বাদে অপূর্ব, সুন্দর গন্ধে ভরা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্যাক করা। জিভে জল আসা মাখনের স্বাদ পেতে হলে আজই বিজয়া মাখন কিনুন।

বিজয়া মাখন–ইস্ কি স্বাদ, দেখলেই সবাই কিনতে চায়

অন্ধ্র ডেয়ারী
(অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)
হায়দ্রাবাদ-৫০০ ৭৮৯



amc/apddc/254/79B

সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটা ঘরের দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

আর কার নাম ধরে ডাকতে লাগল, "এই বটা, বটা, বটা আছিস বাড়িতে?"

কে একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। বড়োমিঞাকে দেখে বললে, "সে তো বাড়িতে নেই বড়োমিঞা—"

"কখন আসবে?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।—"

"তাহলে বাড়িতে বটা এলে বলে দিস বড়োমিঞা এসেছিল। একটা কাম আছে। জরুরি। অনেক টাকার কাম।"

বলে আবার দু'জনেই বস্তির বাইরে চলে এল। রাস্তায় এসে চন্দ্রভানবাবু জিজ্ঞেস করলে, "তাহলে কী হবে বড়োমিঞা? আমার কাজটা যে বড় জরুরি আছে।"

বড়োমিঞা বললে, "আপনি ভাবছেন কেন জনাব। বটা ছাড়া কি বড়োমিঞার আর কোনও শাকরেদ নেই? আমার আরো অনেক শাকরেদ আছে। চলুন না আমার সঙ্গে—"

আবার দু'জনে চলতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে একজন আসছিল। লোকটা সামনে আসতেই বলে উঠল, "সেলাম বড়োমিঞা।"

এতক্ষণে যেন গলার আওয়াজ পেয়ে চিনতে পারলে বড়োমিঞা। বললে, "আরে বটা, তুই? তোর বাড়িতেই তো আমি এক্ষুনি গিয়েছিলুম।"

"কেন?"

"একটা জরুরি কাম আছে এই বাবুর। খুব জরুরি। অনেক টাকা পাবি।"

বটা বললে, "খুন, না চুরি?"

বড়োমিঞা বললে, "এই বাবুর কাজ আছে। করবি?"

"করব না কেন বড়োমিঞা? আমার তো পেশাই এই। আগে জানি খুন না ডাকাতি না জালিয়াতি।"

বড়োমিঞা চন্দ্রভানুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী কাজ একে বলুন? একে বিশ্বাস করে সব বলতে পারেন। এ আমার পুরনো শাকরেদ। বলুন আপনার কী কাজ?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "একটা ছেলেকে চুরি করতে হবে।" (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়



ল্যাজকাহিনী

সরল দে

লম্বা ল্যাজের দম্ভ দেখে
লঙ্কাদ্বীপে অবাক কে?
অবাক রানী মন্দোদরী
অলিন্দে এক গবাক্ষে।

অশোকবনে একটি কোণে
ফেলছে না আর পলক কে?
পলকহারা রামের সীতা
কান্না মোছে অলক্ষ্যে।

আর কে তখন সিংহাসনে
ফুঁসছে রাগে আক্রোশে?
রাবণরাজা লঙ্কাদ্বীপের
জবর রাজা রাক্ষসের।

লম্বা ল্যাজের বিশ্বরেকর্ড—
আকাশছোঁয়া দম্ভ যে।
ল্যাজের ডগা পৌঁছে গেল
সাগরপারে কম্বোজে॥

ছবি দেবাশিস দেব

বড় ব্রিজ ছোট ব্রিজ

কুন্তক

টুম্পির নিজের হাতে লাগানো কাঠচাঁপা গাছে ফুল ধরেছে কটা। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলি ঃ রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন শুনবি, টুম্পি?

শুনব, বলো।

শোন তবে ঃ

ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

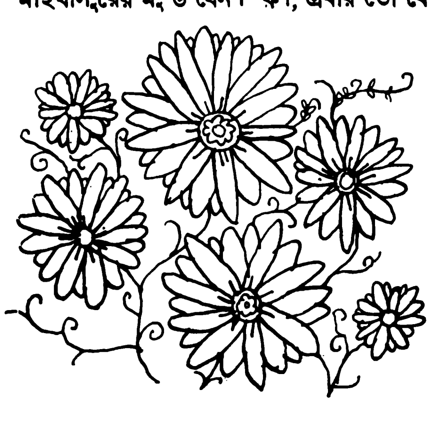
একটু চুপ করে থেকে টুম্পি বলে ঃ কী সুন্দর!

নন্তু অবশ্য ঠোঁট বাঁকায়। বলে ঃ কথার তো আর চেহারা নেই কোনো তাই যার-তার সঙ্গে বসিয়ে দিলেই হল। আরেক জায়গায় গাছ দেখে লিখেছেন না রবীন্দ্রনাথ 'মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে'? গাছও কথা, ফুলও কথা।

ও, চেহারা চাই তোর? আচ্ছা তবে শোন, 'ফুলগুলি যেন আলো পান করবার শিল্পকরা পেয়ালা।' এবার নিশ্চয় বলবি, আলো আবার পান করে কীভাবে। তাই না?

মোটেই না। এবার বলব, যেন-যেন করাও যেমন ভাল নয়, ফুল-ফুল করাও তেমনি সুবিধের নয়। ওইজন্যেই তো লোকে রবীন্দ্রনাথকে—

ও, এই কথা। আচ্ছা বেশ, তাহলে বলি, 'মাঝে মাঝে মরচেধরা কালো মাটি/ মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।' কী, এবার তো বেশ



বলশালী হল? কিংবা ধর, মেঘের ফাঁকে রোদ্দুরকে যদি বলি 'প্লাটিনামের আংটির মাঝখানে যেন হীরে'

বাপ রে, সে তো বেশ দামি অলংকার হবে।

কিন্তু কী অলংকার এখানে হচ্ছে কাকু? উপমা তো? মেলানো হচ্ছে তো একটির সঙ্গে আরেকটাকে?

হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে উপমা বলব না এগুলোকে। এদের ডাকব আরেক নামে, বলব উৎপ্রেক্ষা।

কী ক্ষা?

প্রেক্ষা, উৎ প্রেক্ষা।

নন্তু বলল ঃ মনে রাখা শক্ত হবে বেশ।

শক্ত হবে? ব্লাডিভস্টকও তো শক্ত, তাতে আর কী হল? প্রেক্ষাগৃহ যদি হত, তাহলে?

কিন্তু আগে বলো উপমা নয় কেন এগুলো? উৎপ্রেক্ষা কেন?

বলছি, কেন। যদি বলি ফুলগুলি কথার মতো বা পেয়ালার মতো, তাহলে দুটো জিনিসের মিলের কথাও বলা হল যেমন, তেমনি এ যে আলাদা সে কথাও বুঝিয়ে দেওয়া হল। তাই না? মতো দিয়ে একটা দূরত্বও পাওয়া যাচ্ছে না? আর যখন বলি, ফুলগুলি যেন কথা

তখন দুটো একেবারে এক হয়ে গেল?

একেবারে এক হল না, কিন্তু দূরত্বটা কমে এল অনেক, মিলটা যেন বাড়ল আরো। দুটো ভিন্ন ছবির মধ্যে একটা যোগ তৈরি করছে তো উপমা? একটা ব্রিজ তো? উৎপ্রেক্ষাও তেমনি এক ব্রিজ, তবে কিনা অনেকটা ছোট হয়ে এল এই ব্রিজ। উপমা যেন সারা - ব্রিজ, অনেকটা লম্বা। আর উৎপ্রেক্ষা যেন হাওড়ার ব্রিজ।

আর এইমাত্র যে যেনগুলি বলছ তুমি?

ও, হ্যাঁ, ওখানেও তৈরি হচ্ছে এক ব্রিজ।

উৎপ্রেক্ষারই ব্রিজ দিয়ে উৎপ্রেক্ষার কথা বলতে হল তোমার? বেশ মজা তো। আচ্ছা, ব্রিজটা কি ছোট হতে পারে, আরো?

পারেই তো! সেই নিয়েই তো আমাদের খেলা।

কিন্তু ব্যস, কাকু, এখন হল খেলা ভাঙার খেলা। এখন আমি ক্রিকেট শুনতে যাব। (ক্রমশ)

পিকনিকের মজা

প্রসাদ

পিকনিক খুব জমে উঠেছে। রান্নাবান্নার হ্যাঙ্গাম নেই। বাজার থেকে টুকিটাকি খাবার জিনিস এসেছে। হৈ-হুল্লোড় এমন চলেছে যে, পাড়ায় কোথাও কাক-চিল বসতে পারছে না। তারই ফাঁকে-ফাঁকে লেবেনচুষ, চানাচুর-ভাজা, কমলালেবু এসে পড়ছে আর আসা মাত্র যেন ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনীল বাড়ির ভেতরে গিয়ে মাকে অস্থির করে তুলছে।

Indranil: Mummy, We've nothing to eat. We're starving. You have to give us something to eat.

Mother: It seems I must.

Indranil: May we have some more "chanachur", Mummy? It was so nice!

Mother: No. You've had enough of "chanachur". Too much of that hot, spicy stuff is bound to disagree with you. You mustn't be greedy. I'll see about more oranges and bananas though.

Indranil: Oh, Mummy, you needn't be afraid. We-'re so hungry, we'd digest anything.

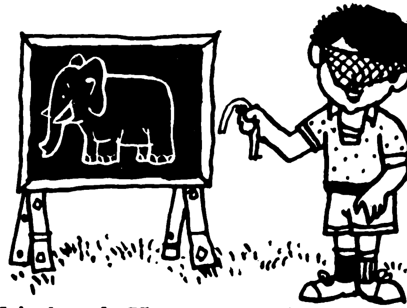
So, Mother had to send for more oranges, bananas and apples.

Meanwhile, the children were having games in the garden.

কী খেলা হচ্ছিল, শুনবে? ভারী মজার একটা খেলা। খেলাটার নাম ঃ

TAILING THE ELEPHANT

There was a black-board in the garden. Somebody had drawn an elephant on the black-board with a piece of chalk. The children had gathered round it. One of them had a strip of cloth covering his eyes. He was thus blind-folded. There was a thin strip of paper in



his hand. He was made to stand at some distance from the blackboard.

The elephant on the blackboard had no tail. The thin strip of paper was its "tail". The blindfolded boy had to walk up to the blackboard. Then he had to fix the "tail" on the elephant. He couldn't see the elephant. So he had to guess where the "tail" should go. Sometimes the children made funny mistakes.

মালবিকার বন্ধু সংগীতার পালা এল। পড়াশোনায় তার খুব মন। খেলাধুলোতেও কম যায় না।

The blind-fold was put on Sangita. She took the "tail" in her hand. With a grave face she walked straight up to the blackboard. She stood before it only for a moment. Then she raised her hand and attached the elephant's "tail" to its big belly. The children screamed with delight.

এবারে লক্ষ করো এই কথাগুলো ঃ

You *have* to give us something to eat.
It seems I *must* (do that)
You *needn't* (need not) be afraid.

নীচের কথোপকথন থেকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে

Q. Must I answer all the questions?
Ans. No, you need not. Answer only three.
Q. Does a fellow have to please everybody?
Ans. No, he mustn't try to do that.

শব্দ-সন্ধান

১	২		৩		■	৪
■		■		■	■	
৫		■	৬	৭		
	■	৮	■		■	
৯			১০	■	১১	
	■	■		■		■
	■	১২				

সংকেত : পাশাপাশি : (১) একটি ঐতিহাসিক আগ্নেয়াস্ত্র, এখন পুজো পায়। (৫) জল আর মাটি মিলে যা হয়। (৬) অধিকার। (৯) পুতুল। (১১) প্রাণীটির দশাসই আকৃতি বোঝাতে অনেকে এই বানানের পক্ষপাতী। (১২) কাল্পনিক পাথর।

উপর-নীচ : (২) হাতির পিঠে বসে। (৩) ভারতের একটি রাজ্যের রাজধানী। (৪) বাংলাদেশের একটি পাহাড়শ্রেণী। (৫) বিখ্যাত নক্ষত্র-মণ্ডল। (৭) বর্ণমালা। (৮) হাতের ব্যঞ্জনা। (১০) নিবিড় বন। (১১) স্নানাগার।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

■	কা	■	■	■	দ	■
মা	লি	কা	■	গা	র	দ
■	মা	■	র	■	গা	■
■	■	ন	জ	র	■	■
■	ক	■	ন	■	ন	■
ন	র্ত	ক	■	র	ঙ্গ	ন
■	ন	■	■	■	র	■

ধাঁধা

পিকনিকে গিয়েছিল ছোট্‌কা। অফিসের পিকনিক। বিরাট হইচই করে হয়। প্রতিবছর শীতকালে বাঁধা প্রোগ্রাম। এবারে হচ্ছে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে কোথায়। সেই কাকভোরে বেরিয়ে গিয়েছে ছোট্‌কা। আমরা তখন গভীর ঘুমে।

ছোট্‌কা ফিরল সন্ধে পার করে। ফিরেই আমায় ডেকে পাঠাল।



আমি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন হল ছোট্‌কা—তোমাদের পিকনিক?"

"খুব ভাল।" ছোট্‌কা আয়েশ করে বসল ইজিচেয়ারে।

"কত লোক হয়েছিল এবার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কত লোক?" ছোট্‌কা আমার প্রশ্নটা শুনে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "সেইটেই তোমায় বার করতে হবে সতুবাবু। সেইজন্যই সাত-তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালাম। কাগজ-কলম খুলে লিখে নাও দেখি।"

তার মানে ধাঁধা! আমি চটপট কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়ি। ছোট্‌কা বলতে থাকে।

প্রথম ধাঁধা ॥ অফিসের বার্ষিক পিকনিকে প্রচুর লোক হয়। অনেক-গুলো স্টেশন ওয়াগন যোগাড় করা হয়েছিল। কথা ছিল, প্রত্যেক স্টেশন ওয়াগনে সমানসংখ্যক লোক নেওয়া হবে। কত জন করে নেওয়া হবে তা অবশ্য বলছি না এখন।

যাই হোক, যেমন ঠিক ছিল, তেমন-সংখ্যক লোক প্রত্যেক স্টেশন ওয়াগনে নেওয়া হল। খানিক দূরে যেতে না-যেতেই দেখা গেল, দশটা স্টেশন ওয়াগন খারাপ হয়ে গেছে। তখন আর কী করা, ওই দশটা গাড়ি বাতিল করে দেওয়া হল। বাকি গাড়িগুলোতে এক জন করে লোক বাড়তি ঢুকিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেক গাড়িতে এক জন লোক বেশি হওয়ায় তেমন অসুবিধে হয়নি। অসুবিধে হল ফেরার পথে। আরও পনেরোটা গাড়ি গেল খারাপ হয়ে। তখন সেই গাড়ি-গুলোকে বাতিল করে যাত্রীদের অবশিষ্ট গাড়িগুলোয় সমান ভাগে উঠিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে দেখা গেল, একেবারে শুরুতে এক-একটা গাড়িতে যত জন করে যাবে ঠিক ছিল, ফেরার পথে প্রত্যেক গাড়িতে তার চেয়ে তিন জন করে যাত্রী বেশি হয়েছে।

কত লোক গিয়েছিল পিকনিকে? একেবারে প্রথমে গাড়ির সংখ্যাই বা কত ছিল?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ তুমি দেখলে সূর্য তোমার ডান দিকে অস্ত যাচ্ছে। কোন্ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ তুমি?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও :

৬ ৪২ ১২ ৮৪ ২৪ — —

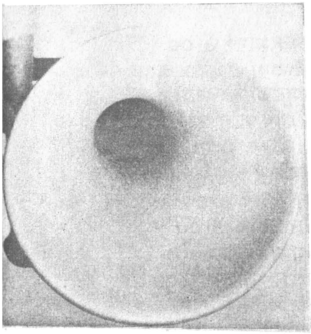
চতুর্থ ধাঁধা ॥ বেমানান শব্দ কোন্‌টি?

বাঘ হরিণ ভাল্লুক গণ্ডার চিল

গতবারের উত্তর ॥ (১) ২১×২১ ইঞ্চি। (২) সীতানাথ ৪৯, অবনী ২১। (৩) ৫। (৪) উ দিয়ে শুরু, এমন কোনো শব্দ।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল

বুড়ো আঙুলের নখের ফোটো

ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ জলেও থাকে স্থলেও থাকে, এ-রকম প্রাণীর উদাহরণ একটা তো বললে ব্যাং, আর একটা উদাহরণ দাও তো?
উঃ আর-একটা ব্যাং।

প্রঃ কাকে জলে ডুবে যেতে দেখলে খুব আনন্দ হয়?
উঃ মাছ-ধরা ছিপের ফাতনাকে।

প্রঃ কোথাকার মেয়েদের বিয়ে হয় না?
উঃ কন্যাকুমারিকার।

প্রঃ কোন্ চতুষ্পদকে সহজেই ঘরের মধ্যে পোষ মানানো যায়?
উঃ তক্তপোষকে।

প্রঃ কোন্ দেশে কে কাকে নিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই?
উঃ কেনিয়া-য়।

প্রঃ মানুষের পা কি কখনো চৌকো হতে পারে?
উঃ হ্যাঁ, পারে। ক্রিকেটের ফিল্ডিং-এ আছে স্কোয়ার লেগ।

সুসেন

মজার খেলা

টেবিলের ওপর পাঁচ রঙের পাঁচটা রঙ-করার মোমপেনসিল সাজিয়ে রাখো। রঙ পাঁচটা ধরা যাক, লাল, নীল, সবুজ, চকোলেট ও কালো। চকোলেটের বদলে হলুদ হতে পারে, আপত্তি নেই। যে-রঙই হোক না কেন, পাঁচটা রঙই হওয়া চাই বেশ আলাদা-রকমের।

মোম-পেনসিলগুলোর পাশে রাখো এক টুকরো কাগজ। মোটা-মুটিভাবে একটা পেনসিল জড়িয়ে লুকনো যায়, এমন মাপের হওয়া চাই কাগজটা।

এবার তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে বন্ধুরা যে-কোনো একটা রঙ-পেনসিল পছন্দ করে কাগজটা দিয়ে মুড়ে রাখবে। বাকি পেনসিল-গুলোকে লুকিয়ে ফেলবে তারা।

তুমি ফিরে এলে তোমার হাতে তুলে দেওয়া হবে কাগজে মোড়ানো পেনসিলটা। তুমি দুটো-হাত একবার পিছনে নিয়ে যাবে, তারপর



সামনে এনে বন্ধুদের হাতে কাগজে জড়ানো পেনসিলটা ফেরত দেবে। এবং বন্ধুদের অবাক করে দিয়ে পছন্দ-করা রঙটা ঠিক ঠিক বলে দেবে।

ম্যাজিকের মতো বিস্ময়কর এই খেলায় একটু চালাকি রয়েছে। কী বলো তো? হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে চটপট কাগজটা খুলে ফেলে ডান হাতের আঙুলের ডগায় রঙ-পেনসিল দিয়ে একটা দাগ দিয়ে নেবে। তারপর ফের মুড়ে ফেলবে কাগজটা। এবার কাগজে মোড়া পেনসিলটা ফেরত দিয়ে দাও। ডান হাতের আঙুলে অল্প রঙ লেগে আছে। সেটা গোপনে দেখে নিয়ে এবার রঙ বলে ফেলো। শক্ত নয় মোটেই। তবে দেখাবার আগে প্র্যাকটিস করে নেওয়া উচিত।

মজারু

হাসিখুশি



গণক : ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না— কম আয়, খারাপ স্বাস্থ্য, চাকুরি-ক্ষেত্রে নানা বাধা-বিপত্তি একের পর এক আসতে থাকবে।

অসীমবাবু : (আশার সঙ্গে) আর ত্রিশ বছর বয়স পার হলে ভাগ্য ফিরে যাবে?

গণক : না, এ-সবই অভ্যেস হয়ে যাবে।



বিনোদবাবুর ডানপায়ে প্রায়ই ব্যথা হওয়ায় ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তাঁকে ভালমতো পরীক্ষা করে বললেন, "কোনো বিশেষ অসুখ আছে বলে মনে হল না। ওটা আপনার বয়সের ব্যাপার। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে তো, এখন ও-রকম ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

বিনোদবাবু বললেন, "কিন্তু আমার বাঁ পায়ে তো কোনো ব্যথা নেই, ওটার বয়সও তো ডানপায়েরই সমান।"

ছবি অহিভূষণ মালিক



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৭ ॥

পূজার্চনার পর ব্রহ্মার স্তব উচ্চারণ করতে করতে হোমের আগুন থেকে মশালটি জ্বালিয়ে পন্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী তুলে দিলেন মোহনবাগান ক্লাবের তখনকার প্রবীণ ফুটবলার ডোঙ্গা দত্তর হাতে। শুরু হয়ে গেল ক্লাবের প্লাটিনাম-জয়ন্তী উৎসবের রিলে দৌড়।

আগেই লিখেছি, ক্লাবের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হওয়ায় মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারা পঁচাত্তর দিন ধরে আমোদ-প্রমোদ এবং নানা খেলাধুলার আয়োজন করেছিলেন মিনি অলিম্পিকের ধাঁচে।

তোমরা শুনেছ, প্রতি অলিম্পিক গেমসের আগে মশাল নিয়ে রিলে দৌড় হয় গ্রীসের অলিম্পাস পর্বতের দেবমন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে—যে মন্দিরের সামনে হত প্রাচীনকালের অলিম্পিক খেলাধুলা। রিলে দৌড় শেষ হয় অলিম্পিক স্টেডিয়ামের দীপাধারে মশাল থেকে পূতাগ্নি জ্বালিয়ে দেওয়ার পর। ওই আগুনকে সাক্ষী রেখে চলে অলিম্পিকের খেলাধুলা।

কীভাবে মশাল জ্বালানো হয় জানো? গ্রীসের কুমারী কন্যারা শোভাযাত্রা করে প্রথমে আসেন অলিম্পাসের মন্দির-প্রাঙ্গণে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত—তিনিও কুমারী—সূর্যরশ্মি থেকে আতস কাচের সাহায্যে পূতাগ্নি জ্বালান মশালে। তারপর অ্যাথলীটদের হাতে হাতে বাহিত হয়ে বহু দেশের মধ্য দিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে সেই মশাল উপস্থিত হয় অলিম্পিক স্টেডিয়ামে।

মোহনবাগানের প্লাটিনাম-জয়ন্তী উৎসবের পূজাপার্বণ হয়েছিল ক্লাবের প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর উত্তর কলকাতার ১৪ নম্বর বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে। তারিখটি ছিল ৬৪ সালের ৫ নভেম্বর। বেলা এগারোটা নাগাদ ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল মশাল-দৌড় ও শোভাযাত্রা। পালতোলা নৌকোর ছাপ দেওয়া সবুজ-মেরুন পতাকা হাতে ক্লাবের কয়েক হাজার সভ্য-সমর্থক তো ছিলেনই, ছিলেন বৃদ্ধ থেকে তরুণ খেলোয়াড়রা ক্লাব ব্লেজারে ভূষিত হয়ে। শোভাযাত্রা এগোচ্ছিল ব্যান্ডের তালে তালে। সবার আগে ছিলেন মশালধারী অ্যাথলীট বা খেলোয়াড়। প্রতিনিয়ত হাত-বদল হচ্ছিল। সবাই চাইছিল একবারটি মশাল হাতে নিয়ে দৌড়তে। সে কী বর্ণময় শোভাযাত্রা। আমরা যে পথ দিয়ে যেখানেই যাচ্ছিলুম—ধরো কীর্তি মিত্রের বাড়ি (ওই বাড়ির সামনের মাঠেই মোহনবাগান প্রথম খেলা শুরু করেছিল), শিবদাস ভাদুড়ীর বাড়ি (১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস), মোহনবাগান লেন—সব জায়গায় বয়ে যাচ্ছিল আনন্দের বন্যা। রাস্তার দুদিকে



দীপাধারে অগ্নি প্রজ্বলনের মুহূর্তে চুনী

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছিলেন, উলুধ্বনি দিচ্ছিলেন। শোভাযাত্রার উপর ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন ফুল ও ফুলের মালা।

নানা পথ অতিক্রম করে শোভাযাত্রা যখন ময়দানে ক্লাব মাঠে এসে উপস্থিত হল তখন ভারত-জার্মান অ্যাথলীট প্রতিযোগিতা শুরু হবার সময় প্রায় হয়ে গেছে। মশাল হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে দীপাধারে অগ্নি জ্বালানোর ভার পড়েছিল আমার উপরে। দীপাধারে আগুন জ্বলে উঠতেই শুরু হল তোপ-ধ্বনি। আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হল রঙ-বেরঙের বেলুন এবং কয়েক ঝাঁক পায়রা। প্লাটিনাম জুবিলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তোপ দাগা হয়েছিল পঁচাত্তরবার। দীপাধারের শিখা অনির্বাণ ছিল পঁচাত্তর দিন ধরে।

জয়ন্তী-উৎসবের অ্যাথলেটিকসে জার্মানির সেই অ্যাথলীটদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাঁরা টোকিও অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভারত দলেও ছিলেন সব অলিম্পিক অ্যাথলীট। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শপথবাক্য আমাকেই পাঠ করতে হয়েছিল দুই দেশের অ্যাথলীটদের পক্ষে। প্রতিযোগিতা হয়েছিল দুদিন। বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছিল।

জুবিলী উৎসবের বড় আকর্ষণ ছিল হাঙ্গারির তাতাবানিয়া দলের ফুটবল খেলা। একটি দুটি নয়, ভারতে তাতাবানিয়া খেলেছিল পাঁচটি ম্যাচ। কলকাতায় তিনটি এবং দিল্লিতে দুটি। শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচটি ছাড়া বাকি চারটি খেলাতেই অধিনায়কের ভার পড়েছিল আমার উপর।

ফুটবলের টেকনিক-ট্যাকটিকস এবং ট্যালেন্ট ও স্কিলের গুণে যে-সব বিদেশী দল আমাদের দেশে এসে সুনাম কুড়িয়ে গেছে তাতাবানিয়া তাদের অন্যতম দল। হাঙ্গারি সে বছরই টোকিও অলিম্পিকে ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়। হাঙ্গারির রাজধানী বুদাপেস্টের তিন নম্বর দল ছিল তাতাবানিয়া। দলের দুই-তিনজন খেলোয়াড় খেলেছিলেন টোকিও অলিম্পিকে। টি সারনাই রাইট ইনে এবং জি সেপেসি রাইট হাফব্যাকে। তাতাবানিয়া দলে সারনাই কিন্তু খেলেছিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ডে। তাঁর খেলা যেন আজও চোখে ভাসছে। প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলছি, আমাদের দেশে আমরা দেশী-বিদেশী যত ফুটবলার দেখেছি তাঁদের মধ্যে সারনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন সর্বশ্রেষ্ঠ আমি পরে ব্যাখ্যা



তাতাবানিয়া বনাম মোহনবাগান। খেলা শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে

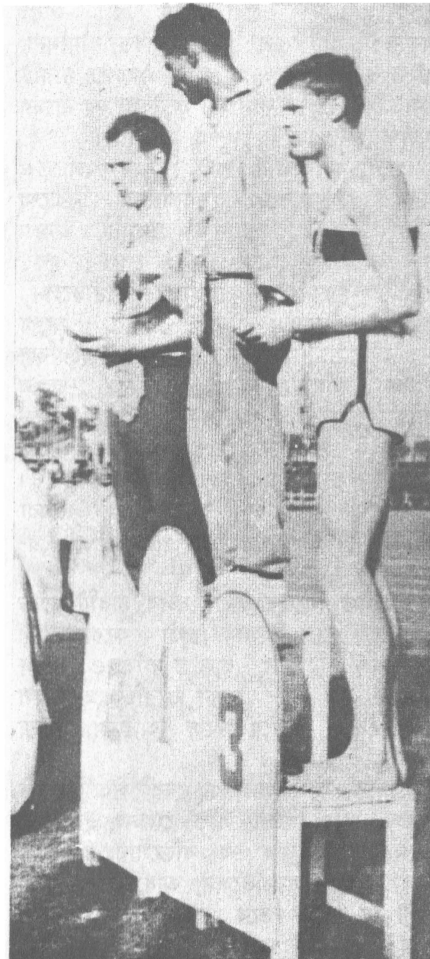
করব। আগে খেলাগুলির কথা বলে নিই।

আঠারোই নভেম্বর তাতাবানিয়া কলকাতায় প্রথম ম্যাচ খেলল আমাদের মোহনবাগানের সঙ্গে। আমরা সহজেই হেরে গেলুম ০—৩ গোলে। নয় মিনিটের মধ্যেই তিনটি গোল হয়ে যাওয়ায় তাতাবানিয়া খুব একটা গা লাগিয়ে খেলেনি, যদিও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের গা থেকে অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। প্রথম দুটি গোল করেছিলেন সারনাই। তৃতীয়টি সারনাইয়ের পাস থেকে নেগি।

কুড়ি নভেম্বর তারিখে দ্বিতীয় ম্যাচে তাতাবানিয়ার কাছে ইস্টবেঙ্গল হারল ৫—১ গোলে। ফল দেখে তোমাদের মনে হতে পারে ইস্টবেঙ্গল বুঝি আমাদের চেয়েও খারাপ খেলেছিল। তা কিন্তু নয়। গোল বেশি খেয়েছিল, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দারুণ লড়েছিল তাতাবানিয়ার সঙ্গে। ওরা ৩—০ গোলে এগিয়ে যাবার পর ইস্টবেঙ্গলের পি সিংহ রকেটের মতো শটে একটি গোল শোধ করে দিয়েছিল। তারপর কিছু সময় ধরে চালিয়েছিল জোর আক্রমণ। খেলা খুব জমে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল বাকি দুটি গোলও বুঝি শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষরাতে। শেষ তিন মিনিটে তাতাবানিয়া আরও দুটি গোল করে। পাঁচটি গোলের দুটি করে পেয়েছিলেন সারনাই ও সেকারেস, একটি পেয়েছিলেন নেগি।

দুটি খেলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের পর আমরা ভেবেছিলুম সর্ব-ভারতীয় শক্তি নিয়ে তৃতীয় ম্যাচে আমরা ওদের হারিয়ে দেব। কিন্তু বাইশে নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচেও তাতাবানিয়া ৩—১ গোলে হারাল নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন একাদশকে। ওদের পক্ষে গোল করলেন মেনেজেল দুটি ও সারনাই একটি। আমাদের পক্ষে একটি গোল শোধ করল পি কে। পি সিংহর একটি দারুণ জোরালো শট গোলকীপার লেলিকের হাতে লেগে জমিতে পড়তেই পি কে কাছ থেকে দৌড়ে গিয়ে বল গোলে ঠেলে দেয়।

সারনাইয়ের খেলার কথায় ফিরে আসি। তিনটি ম্যাচের পাঁচটি গোল দেখে আমি সারনাইকে বিচার করিনি। কিম্বা আরও তিনটি গোলে তাঁর কৃতিত্বের ভাগ ছিল বলেও



ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিকসের একটি প্রতিযোগিতার শেষে

নয়। আমি দেখেছি দুরন্ত গতির মধ্যে বল কন্ট্রোলে রেখে তাঁর খেলার ছন্দ। আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন পাঁচ-ছয়জন ডিফেন্ডারকে একে একে ডজ করে এবং বডি-সোয়ার্ভে কাটিয়ে। এ আই এফ এফ-এর বিরুদ্ধে গোলটি করেছিলেন অরুণ ঘোষ, জারনেল সিং, নাইম, ইউসুফ খাঁ ও পি সিংহকে নিয়ে রচিত কপাট-আঁটা ডিফেন্সকে ধোঁকা দিয়ে। চমৎকার ছিল তাঁর পায়ের কাজ এবং গতির চমক।

ফুটবল-বিশারদরা বলে থাকেন কমপ্লিট

ফুটবলার হতে গেলে চারটি 'এস' থাকা দরকার। চারটি 'এস' হচ্ছে—স্পীড, স্ট্যামিনা, স্ট্রেংথ ও স্কিল। আমি বলব, এ-ক্ষেত্রে চারটি 'এস' দিয়ে তৈরি কমপ্লিট ফুটবলারের নামের আদ্যক্ষরও 'এস'। অর্থাৎ, সারনাই।

শুধু কলকাতায় নয়, দিল্লির খেলাতেও সারনাই আমাদের মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দুটি গোল করেছিলেন। প্রথমটি অবশ্য পেনাল্টি কিক থেকে। কিন্তু খেলার একই ছন্দে দর্শকদের মন রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। দিল্লিতে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাতাবানিয়ার প্রদর্শনী খেলা হয়েছিল ডুরান্ড কমিটির বিশেষ ব্যবস্থায়। তখন চলছিল ডুরান্ড কাপের খেলা। পরে ডুরান্ড কমিটির প্রেসিডেন্টের একাদশের সঙ্গে ওখানে তাতাবানিয়ার আর একটি খেলা হয়। সে খেলার ফল ছিল গোলশূন্য। আমরা সেদিন সত্যিই দারুণ লড়ে পরাজয় এড়িয়েছিলুম।

আমার নিজের কথায় বলব, চারটি ম্যাচে সাধ্যমত ভাল খেলার চেষ্টা করেছিলুম। অধিনায়ক হিসাবে বাড়তি দায়িত্বও ছিল আমার ওপর। তাই চেষ্টা করেছিলুম বল দেওয়া-নেওয়া করে খেলে আক্রমণ রচনা করতে।

কলকাতার খেলার পর বেরী সর্বাধিকারী তাতাবানিয়ার খেলার গতি, ফেনিং, ইনসাইড ও আউটসাইড ডজ এবং বডিসোয়ার্ভের উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, আধুনিক ফুটবল খেলা যে কোন স্তরে উঠেছে তারই আভাস দিয়ে গেল ফেরেঙ্ক পুসকাসের দেশের এই দলটি। দুঃখ করেছিলেন পরলোকগত রহিম সাহেবের অকাল মৃত্যুর জন্য। লিখেছিলেন, রহিম সাহেব বেঁচে থাকলে এই ফুটবল-বিজ্ঞানের কিছু তুলে নিয়ে ভারতীয়দের ওপর প্রয়োগ করতে পারতেন। আমার খেলার সুখ্যাতি করে বেরীদা লিখেছিলেন—"ফুটবল-গুরু দুঃখীরাম মজুমদার বলতেন ট্যালেন্ট ও স্কিল ছাড়াও উঁচু পর্যায়ের ফুটবলারদের মাথার পেছন দিকেও দুটি চোখ থাকে। কল্পনার চোখ। ওই চোখ দিয়েই তারা মুভমেন্ট আন্দাজ করে নিতে পারে। তাতাবানিয়ার সঙ্গে খেলায় দেখা গেল শুধু চুনী গোস্বামীরই ওই চোখ আছে। তার সতীর্থদের সবারই শুধু দুটি চোখ। তাই চুনীর বল দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয়রা আক্রমণ ধারালো করতে পারেনি।"

ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তীতে টোকিওর সোনাজয়ী অলিম্পিক হকি দলের সঙ্গে প্রদর্শনী হকি খেলা এবং বিদেশের নামী টেনিস খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী টেনিস খেলা তো হয়েছিলই। আর হয়েছিল দুটি উঁচু স্তরের ক্রিকেট ম্যাচ। একটি তিন দিনের, একটি পাঁচ দিনের। প্রথম ম্যাচটি হয়েছিল আঠাশ, উনত্রিশ ও ত্রিশ নভেম্বর কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে জুবিলী কমিটির চেয়ারম্যানের দলের। দুই থেকে সাত ডিসেম্বর (চার ডিসেম্বর বিরতি) হয়েছিল কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ওয়েস্টবেঙ্গল চীফ মিনিস্টারস একাদশের পাঁচদিনব্যাপী খেলা। প্রায় টেস্ট খেলাই বলা যায়।

কমনওয়েলথ দলে খেলেছিলেন—পিটার রিচার্ডসন (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু, সোবার্স, কাউড্রে, বুচার, নাইট, মুস্তাক মহম্মদ, ব্রায়ান ক্লোজ, মর্টিমোর, কোল্ডওয়েল, গিবস, ক্যামি স্মিথ।

চীফ মিনিস্টারের দলে ছিলেন—মনসুর আলী খাঁ পতৌদি (অধিনায়ক), জয়সীমা, বোরদে, হনুমন্ত সিং, মঞ্জরেকর, দুরানি, চন্দ্রশেখর, রামকান্ত দেশাই, দিলীপ সারদেশাই, তামানে, সুব্রহ্মনিয়াম।

দুই দলের সবাই তখন স্টার ক্রিকেটার। দুটি দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট যতখানি প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য হতে পারে তাই হয়েছিল। সোবার্সের শৌর্যময় ব্যাটিং, বোরদের বাড়তি বিক্রম, কাউড্রের রাজকীয় স্ট্রোক, মুস্তাক মহম্মদের মনমাতানো ব্যাটিং এবং দুরানির দীপ্তি যেন এখনও চোখের উপর ভেসে উঠছে। সোবার্স করেছিলেন ৮৩ ও ১০২ রান, কাউড্রে ৬৬ ও ১২, মুস্তাক মহম্মদ ৫৯ও ৫১, বোরদে ১২৪ ও ৫৭ এবং দুরানি ৯২। জয়পরাজয়ের প্রশ্নে পঞ্চম দিনের শেষে খেলার মধ্যেও দেখা দিয়েছিল নাটকীয় উন্মাদনা। কমনওয়েলথ দল জিতেছিল মাত্র এক উইকেটে। বিপক্ষ দলের জয়ের মুহূর্তে পরাজিত অধিনায়ক পতৌদি কী করছিলেন জানো? আলি হোসেনের সানাই শুনছিলেন। পরের দিন কাগজে লেখা হল সুরবাহার ক্রিকেটার। (ক্রমশ)



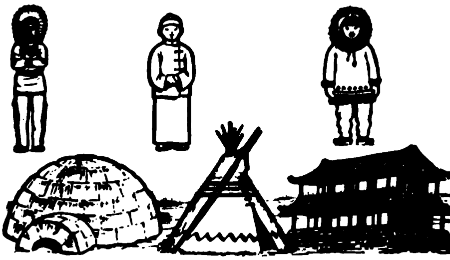
দুপুরবেলার বন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

দাঁতাল হাতি আমার সাথী
বুঝলে মহাশয়,
তাই না দেখে বাঘভাল্লুক
পাচ্ছে ভীষণ ভয়।
বীর হনুমান সিঁড়ির নীচে
দিচ্ছে তিড়িং লাফ,
নেকড়েমশাই বাংলাতে ফেল,
করছে মনস্তাপ।
হরবোলা এক হায়না সেজে
আছেন পাহারায়,
গুরুজন কেউ আসছে কিনা
দেখা তাঁরই দায়।
চেয়ারটেবিল জলজঙ্গল
হয়তো সোঁদরবন,
দুপুরবেলা সবাই যখন
ঘুমে অচেতন
এমন সময় কলিংবেলটা
বাজল যেই জোরে,
হায়নামশাই বলে উঠল,
“বাবা আসছে, ওরে!”
অমনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল
লতাপাতার বন ;
মিনি, বাচু, মুন্না, রাজু
পড়ায় দিল মন।

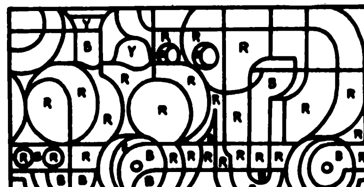
ছবি দেবাশিস দেব

ছবির মজা



উপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে একজন রেড ইন্ডিয়ান, একজন চীনা ও একজন এস্কিমো। তাদের নীচে আছে পাশাপাশি তিনটি বাড়ি। কে কোন বাড়িতে থাকে, বলতে পারো?

(উত্তর। বাঁ দিকের বাড়িতে থাকে এস্কিমো, মাঝখানের বাড়িতে থাকে রেড ইন্ডিয়ান, ডানদিকের বাড়িতে থাকে চীনা।)



এই নকশার ইংরেজি আর-মার্কা খোপগুলি লাল পেনসিলে, ইংরেজি বি-মার্কা খোপগুলি নীল পেনসিলে ও ইংরেজি ওয়াই-মার্কা খোপগুলি হলুদ পেনসিলে ভরাট করলেই সুন্দর একটা খেলনা-ইঞ্জিন পেয়ে যাবে। করেই দ্যাখো।



আরও ভাল

দিগ্‌দর্শক

কিছুতেই খুশি করা যায় না সার্কাসের মালিক হরিপদ সামন্তকে। তিনি কারুর খেলাতেই সন্তুষ্ট নন। সুবীর তারের উপর দিয়ে দু-হাত ছেড়ে, কাঁধে দু-জনকে নিয়ে সাইকেল চালাতে পারে বলে তার খুব গর্ব ছিল। কিন্তু হরিপদ সামন্ত তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই যেন আনেন না। বলেন, তারের উপর দিয়ে তো ঘণ্টিও সাইকেল চালাতে পারে, ও আর এমন কী? ঘণ্টি হল একটা কাকাতুয়ার নাম। ধবলগিরির সার্কাসে অবশ্য চমৎকার-চমৎকার খেলা দেখানো হয়—যেমন দশটা হাতি ঢাকঢোল বাজায় তালে তালে, কখনও আবার সেই হাতিরা বালতি থেকে জল শুঁড়ে করে নিয়ে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেয়— অবশ্য দর্শকদের গায়ে লাগে না, কিন্তু বেশ মজার দৃশ্য হয়। সেই হাতির খেলোয়াড়কে হরিপদ সামন্ত বলেন, এমন কিছু খেল্‌ দ নয় এটা, রাস্তার হোসপাইপওয়ালারা ওর চাইতে অনেক ভাল জল দেয়, আর ঢাকঢোল বাজানো? ওর চাইতে সহজ কাজ দুনিয়াতে নেই।

এই কারণে সার্কাসের লোকেরা হরিপদ সামন্তর উপর তেমন খুশি নয়। তারা নিজে-দের মধ্যে গজগজ ফুসফাস করে। চাপা অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সময় হঠাৎ একজন আশ্চর্য লোক সার্কাসে খেলা দেখানোর চাকরি চাইতে এল। লোকটির হাতে একটা সুটকেস, চোখে আশার আলো। আর চমৎকার আত্ম-বিশ্বাস। সে এসেই মালিক হরিপদ সামন্তর সঙ্গে দেখা করে বলল, "আমার নাম বিটু। আমি এমন একটা খেলা শিখে এসেছি বার্মা থেকে যা দেখে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।" হরিপদ সামন্ত বললেন, "স্তম্ভিত হয়ে যাব? কই, দেখাও তো তোমার খেল!"

কোনো কথা না বলে বিটু তার সুটকেস খুলল, তা থেকে দুটো বিরাট পাখির মতো পাখা বার করল। তারপর দু হাতে দুটো পাখা দৃঢ় ভাবে ধরে একটা টেবিলের উপর উঠে কিছুক্ষণ কী যেন মন্ত্রের মতো আবৃত্তি করল, তারপর এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে উড়তে লাগল, আর পাখা ঝটপট করতে-করতে একবার এদিক একবার ওদিক করতে লাগল। কিছুক্ষণ এইভাবে উড়বার পর সে পাখির মতো ডাকতে লাগল, ঠিক যেন বিরাট একটা কোকিল ডাকছে। এইভাবে দশ মিনিট গেল। তারপর বিটু নেমে এল, এসে টেবিলের উপর দাঁড়াল। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সে আস্তে আস্তে পাখা দুটো খুলে সুটকেসে ভরল। তারপর নেমে এসে দাঁড়াল হরিপদ সামন্তর সামনে।

সার্কাসের অন্য প্রায় সবাই এইরকম আশ্চর্য খেলা দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। হাতির খেলোয়াড় ভাবছিল, খুব ভাল হয়েছে এবার। এবারে হরিপদ সামন্তকে জব্দ করার লোক এসে গেছে!

কিন্তু হরিপদ সামন্তকে জব্দ করে কে? তিনি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়িতে টান দিয়ে বললেন, "তা তুমি দেখছি পাখিকে নকল করতে পারো, পাখির মতো ডাকতেও পারো। ভাল খেলা-টেলা শিখেছ কিছু?"

ছবি দেবাশিস দেব

খাওয়াদাওয়া





কাক খায় কাঁটা
বক খায় জল
মাছ খায় আটা
আমি খাই ফল

অতনু তালুকদার (বয়স ৬)

সাদা বাড়ি

আমার বাবা তিন মাস আগে একটা বাড়ি কিনেছেন। বাড়িটা সাদা রঙের, ভেতরটা ভীষণ ঠান্ডা আর খুব ছোট। আমরা কেউই ঢুকতে পারি না। তবে, আমাদের এই বাড়িতে নানা রকমের খাবার থাকে।

অবাক হওয়ার কথা—একটা গোটা মাছ এই বাড়িতে তিন-চারদিন টাটকা থাকে। বাড়িতে পাঁচটা ঘর, কিন্তু আলো মাত্র একটা।

বাড়িটা চিনতে পেরেছ তো? ওটা হল একটা রেফ্রিজারেটর।

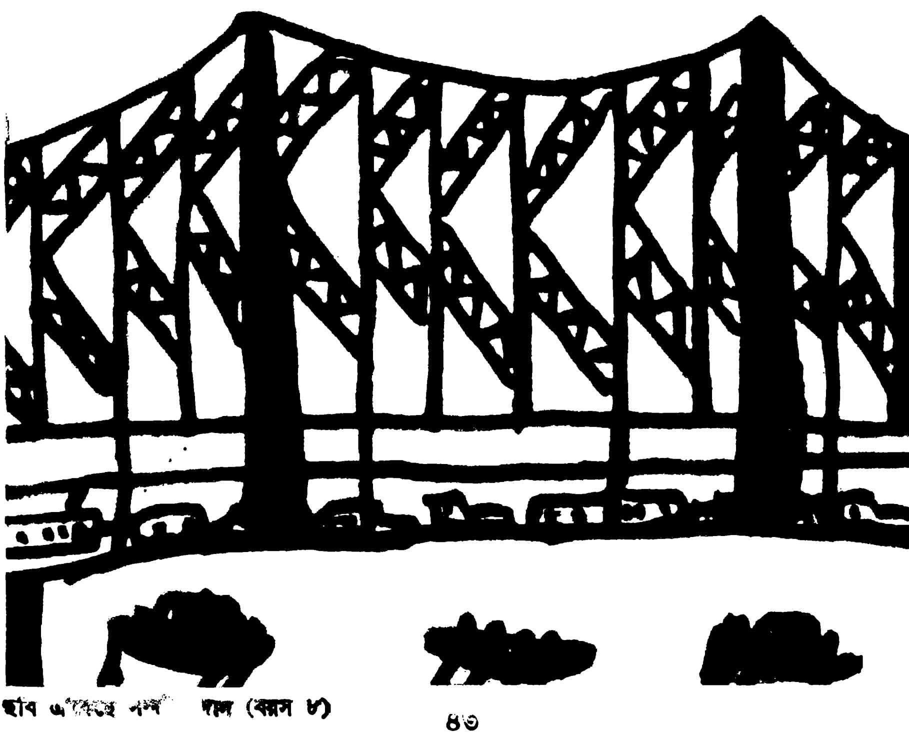
প্রান্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৬)



পুতুল

পুতুল পুতুল পুতুল—
পাহাড় যেমন দাঁড়িয়ে থাকে
তেমনি তুমি দাঁড়িয়ে থাকো
বলছে মোদের তুতুল।

গোপা চক্রবর্তী (বয়স ৮)



ছবি এঁকেছে পর্ণা [illegible] দাস (বয়স ৮)

বন্ধু টিকটিকি



আমি জানি, আমার গল্পের নামটা পড়ে সবাই হাসবে। কারণ টিকটিকি কখনও মানুষের বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু সত্যিই একটা বাচ্চা টিকটিকির সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। সন্ধেবেলা আমার বন্ধু আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে পড়ার ঘরে আসে। জানলার ফাঁক দিয়ে এসে আমার দিকে তাকায় পিটপিট করে। সে আমাকে ভয় পেত। কিন্তু ভাব হওয়ার পরে আর ভয় পায় না।

সে এসেই আমাকে বলে, ''দিনটা ভাল গেছে তো তোমার?'' অথবা ''শরীরটা ভাল তো?'' কারণ, প্রায়ই আমার শরীর খারাপ থাকে। সেইজন্যেই ও আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে। 'প্রশ্ন করে' মানে, ওর চোখ-মুখ দেখলেই মনে হয়, ও ওইসব কথা বলছে। আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দিই। কখনও বলি, ''ভাল আছি,'' কখনও বলি, ''তুমি ভাল তো—'' তারপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। ওকে দেখে মনে হয়, আমাকেও ওর খুব ভাল লাগে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পরে আমি বুঝতে পারি যে, বন্ধুর খিদে পেয়েছে। আমি টেবিল-ল্যাম্পের চারিদিকের উড়ন্ত কয়েকটা পোকাকে ধরে বন্ধুর মুখের কাছে দিই। ও তখন কপাত কপাত করে সব-কটা পোকা খেয়ে ফেলে। পেট ভরে গেলে আর খায় না। কৃতজ্ঞতার চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর আমকে সেই রাত্রির মতো বিদায় জানিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে কোথাও চলে যায়। বন্ধুবিরহে মনটা তখন দুঃখে ভরে ওঠে।

রীতা ভৌমিক (বয়স ১৬)



ছবি এঁকেছে **মীনাক্ষী দত্ত** (বয়স ১৩)



আগন্তুক

অভীক বর্মণ

মধ্যরাতে হু-হু করে ছুটে চলেছে দিল্লি মেল। তারই এক কামরায় বসে আমি ও আমার বন্ধু সুজিত। শীতকাল। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আর সুজিত গায়ে মোটা কম্বল জড়িয়ে বসে তাস খেলছি।

ট্রেন আস্তে আস্তে একটা স্টেশনের ভেতরে ঢুকল। লোকজন বিশেষ নেই। ট্রেন এখানে থামবার কথা নয়। তবু কেন থামল, কে জানে। লাইনে হয়তো গণ্ডগোল আছে। এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের কামরার দরজা খোলার শব্দ হতেই চমকে ঘুরে তাকালাম দরজার দিকে। দরজা খুলে কামরায় যে ঢুকল তার চেহারা একেবারে ডিটেকটিভ বইয়ের 'রহস্যজনক ব্যক্তির' মতো। গায়ে কলার তোলা বর্ষাতি, মাথায় টুপি, এক হাতে একটা সিগারেট, অন্য হাতটা পকেটের ভেতর।

কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম, "এটা রিজার্ভড কামরা।"

লোকটি বলল, "শুধু এই রাত্তিরটা থাকব, প্লীজ।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সুজিত বলে বসল, "ঠিক আছে।" আমি চুপ করে গেলাম। লোকটি তার টুপি ও বর্ষাতি খুলে ফেলল। ওর পরনে টুইডের প্যান্ট আর চেককাটা নীল শার্ট। লোকটির মুখের রঙ অদ্ভুত রকমের সাদাটে। এরকম গায়ের রঙ আমি কখনও দেখিনি।

লোকটি আমাদের উলটো দিকের বেঞ্চিটায় বসল। আমরা আবার তাস খেলতে শুরু করলাম। ঘড়িতে রাত সাড়ে ন'টা। কামরায় সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোক থাকার ফলে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলা যাচ্ছিল না। লোকটি আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। লোকটির চোখ দুটো আশ্চর্যরকম জ্বলজ্বলে। মনে হয় যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। লোকটিকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। সিগারেট খেয়ে চলেছিল ক্রমাগত। আমরা অনেক চেষ্টা করেও খেলায় মন দিতে পারছিলাম না। শেষকালে তাস বাক্সে পোরা হল। শীত যেন আরও বেড়েছে। হঠাৎ লোকটির হাত থেকে তার দেশলাইয়ের বাক্সটা পড়ে গেল। আমি তুলে দিলাম। রহস্যময় আগন্তুক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনাদের ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগে?"

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু......"

"আমি একটা ঘটনা বলব, শুনবেন? এটা



অবশ্য আমারই অভিজ্ঞতা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," আমরা একই সঙ্গে উত্তর দিলাম।

"আগে আমি ভূতে বিশ্বাস করতাম না। এই ঘটনার পর থেকে করি।" কথাটা বলে লোকটি একটু থামল। লোকটির কণ্ঠস্বর কেমন যেন অদ্ভুত।

আগন্তুক বলে চলল, "অনেকদিন আগে এ গল্পের শুরু। এক বিরাট জমিদারের কাছে একজন রহস্যময় আরব ব্যবসায়ী আসে। কর্তামশাই অর্থাৎ জমিদারবাবুকে সে মস্ত একটা মুক্তো দেখায়। কর্তাবাবু মুগ্ধ হয়ে সেটা কিনে নেন। কিন্তু, মুক্তা কেনার ঠিক এক বছর পরে কর্তামশাইয়ের অপঘাতে মৃত্যু হয়। তিনি সাপের কামড়ে মারা যান। পরের বছর ঠিক ওই একই দিনে তাঁর বড় ছেলে সমুদ্রে চান করতে গিয়ে ডুবে যান। তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় চার দিন পরে।

"তৃতীয় বছর আবার সেই দিন ফিরে এলে সেই জমিদার-বংশে একটা আশঙ্কা জাগে। সবাই সতর্ক থাকেন। কিন্তু তবু কী-ভাবে যেন দোতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ছোট ছেলেও মারা যান। সংসারে হাহাকার পড়ে যায়। সবাই বলাবলি করে যে, ওই মুক্তোটাই অভিশপ্ত। মুক্তোটাকে ফেলে দেওয়া হোক।

"ছোট ছেলের একমাত্র ছেলে জমিদার বংশের শেষ বাতি। সে হেসে সব-কিছু উড়িয়ে দিয়ে বলল, মুক্তোর কারচুপি সে দেখে নেবে।"

এই পর্যন্ত বলে লোকটি থামল। হু-হু করে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাইরে বৃষ্টি, অন্ধকার। কামরার ভিতরে থমথমে আবহাওয়া। আমাদের গা-হাত-পা শিরশির করছিল।

লোকটি অদ্ভুত গলায় আবার বলতে শুরু করল, "আর এক বছর পূর্ণ হল। আবার সেই অভিশপ্ত দিন। আজই এই দিল্লি মেলে কাটা পড়েছে সেই শাপগ্রস্ত পরিবারের একমাত্র বংশধর, অর্থাৎ আমি!"

"অ্যাঁ! কী-ই-ই!" আমাদের মুখ থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল।

লোকটি হঠাৎ উঠে পড়ে চলন্ত ট্রেনের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমার গল্প শেষ। আমি যাচ্ছি।"

সুজিত ততক্ষণে প্রায় জ্ঞান হারিয়েছে। আমি ভয়ে অথর্ব হয়ে বসে আছি। আগন্তুক কিন্তু ফিরেও তাকাল না। চলন্ত ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা আপনা থেকে দড়াম করে খুলে গেল। তারপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগল। আমরা কাঁপতে লাগলাম থর-থর করে।

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



সুনীল গাভাসকার ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

পাতা ওলটালেই সুনীলের খবর

চীপকে তেইশ নম্বর

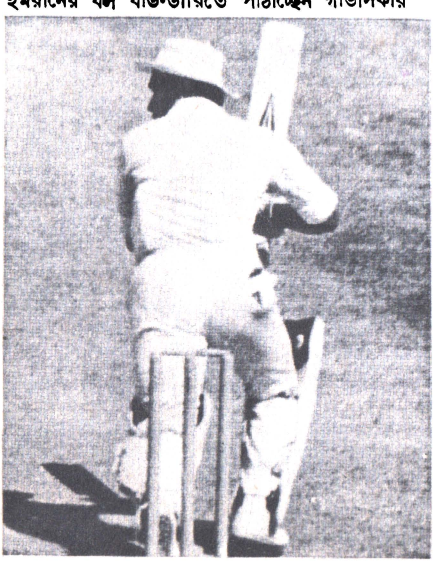
রঞ্জিতকুমার ঘোষ

১৯৭১-এর ২২ মার্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গায়ানার জর্জটাউনে বৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, "তাতে কী? কত জায়গাতেই তো বৃষ্টি হয়।" যদি বলি, লাঞ্চের পর একজন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি পূর্ণ হওয়ার ঠিক পরেই বৃষ্টি নেমে কিছুক্ষণের জন্যে খেলা বন্ধ হয়েছিল, তা হলেও অনেকের কাছে সে-কথা একটা সাধারণ ঘটনার বেশি কিছু বলে মনে হবে না। কিন্তু যদি বলি ঐ ব্যাটসম্যানটি হলেন ভারতের পয়লা নম্বর ব্যাট সুনীল মনোহর গাভাসকার তাহলে প্রত্যেকেই ভাববেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে।

আছে। কারণ ওটাই ছিল গাভাসকারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে ওই সেঞ্চুরির (১১৬) সাহায্যেই গাভাসকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এসেছেন এবং থাকবেন। আর, বৃষ্টির কথা তুললাম এই জন্যেই যে ওটা যেন একটা ইঙ্গিত! প্রকৃতি-দেবী হয়ত বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, যে-ছেলেটি এইমাত্র জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেলেন, তিনি আরও অনেক শতরান করে বহু প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ধুয়ে-মুছে দেবেন। বৃষ্টিধারার মতোই।

ইমরানের বল বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছেন গাভাসকার



ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

তারপর থেকে গত জানুয়ারিতে চীপকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট পর্যন্ত গাভাসকারের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস হল তেইশটি সেঞ্চুরির ইতিহাস। এখন সুনীল গাভাসকার মানেই সেঞ্চুরি। 'সুনীল কত রান করেছেন', এ-প্রশ্ন এখন আর কেউ করে না। সবাই জানতে চায়, সুনীল সেঞ্চুরি করেছেন কিনা। আর সেঞ্চুরি করলে লোকে সেটাকে খবর বলে মনে করে না, না-করলেই করে। এবং আগামী কিছুকাল পর্যন্ত ভারতের তথা বিশ্বের ক্রিকেট-অনুরাগীদের মনে যে-প্রশ্ন আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা হল, সুনীল কি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙতে পারবেন?

সুনীলের সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা অবশ্যই আছে। তবে ভাগ্যদেবীকে একটু প্রসন্ন হতে হবে বই-কী!

সে যাই হোক, সেঞ্চুরির সংখ্যার দিক থেকে সুনীল এখন বিশ্বে তৃতীয়। দুই স্যার —ডন ব্র্যাডম্যান ও গারফিল্ড সোবার্সের পরেই সুনীল। অবশ্য ব্র্যাডম্যান ২৯টি সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র ৫২টি টেস্টে। সোবার্সের ২৬টি সেঞ্চুরি করতে লেগেছে ৯৩টি টেস্ট। তিন-জনের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের গড় (৯৯.৯৪) সব চেয়ে ভাল। তেমনি সোবার্সের মোট রান (৮,০৩২) আর সর্বোচ্চ রান (৩৬৫ নট আউট)।

মোট টেস্ট, ইনিংস-সংখ্যা, কতবার নট আউট, মোট রান, সর্বোচ্চ রান, সেঞ্চুরি সংখ্যা ও রানের গড় এই ক্রমে ব্র্যাডম্যানের সংখ্যাগুলি হল—৫২, ৮০, ১০, ৬৯৯৬, ৩৩৪, ২৯, ৯৯·৯৪ আর সোবার্সের ৯৩, ১৬০, ২১, ৮০৩২, ৩৬৫ নট আউট, ২৬ ও ৫৭·৭৮। পেছন-পেছন আসছেন সুনীল। চীপক টেস্ট পর্যন্ত তাঁর সংখ্যাগুলি হল ৬১, ১১০, ৮, ৫৮৪২, ২২১, ২৩, ৫৭·২৭।

শেষ পর্যন্ত সুনীল কী করবেন জানি না। তবে তোমাদের মতো আমারও ইচ্ছে করছে ৪০এ স্যার ভালচন্দ্র রোড, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪ ঠিকানায় তাঁকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিতে—'যা করবার তাড়াতাড়ি করে ফেলুন, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

গাভাসকারের কথা

অরিজিৎ সেন

সুনীল মনোহর গাভাসকার হয়তো আর কোনোদিন ভারতের অধিনায়ক হবেন না। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তিনি এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে যাবেন এদেশের ক্রিকেটে। মাত্র ৩১ বছর বয়সে তিনি দু-দুবার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

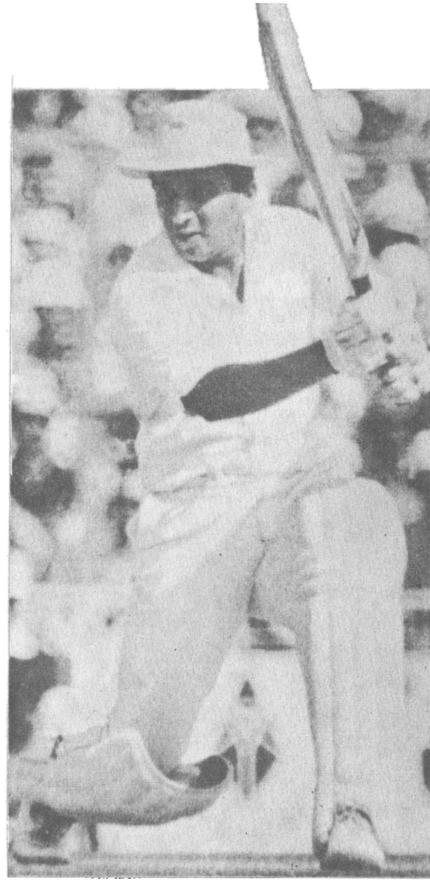
ছোটখাটো চেহারার এই মানুষটি এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখানে আর কোনো ভারতীয় খেলোয়াড়ের যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ, ক্রিকেট-জীবনের প্রথম দিকে ওঁর ভাগ্য বেশ বিরূপ ছিল। টেস্ট কেন, হয়তো প্রথম শ্রেণীর খেলাতেও কখনও সুযোগ পেতেন না তিনি। বম্বের ছেলে সুনীল ওই শহরের রঞ্জি দলে স্থান পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। যদিও, স্কুল এবং কলেজে নিজের ব্যাটিং - দক্ষতা তিনি ক্রমাগত দেখিয়ে গিয়েছিলেন। নিরুপায় হয়ে তিনি আন্তঃ-রাজ্য ট্রান্সফার নিলেন। উদ্দেশ্য, কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবে খেলা। শেষ মুহূর্তে নতুন করে সুযোগ পেয়ে তিনি বম্বেতেই থেকে গেলেন।

সেই সুনীলের নামে আজ রেকর্ডের মালা। শুধু ব্যাটস্ম্যান নয়, অধিনায়ক হিসেবেও। যিনি কখনও টেস্ট-খেলোয়াড় হওয়ার কথা ভাবতে পারেননি, সেই তিনিই আজ ভারতের অধিনায়কত্বের পদে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

ভারতের ১৯ জন অধিনায়কের মধ্যে গাভাসকারই উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। বেদী অসুস্থ হলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে তিনি অধিনায়ক ছিলেন। সেই টেস্টে ভারত জেতে।

কালীচরণের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিম হিউজের অস্ট্রেলিয়া এবং এখন আসিফ ইকবালের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে তিনি 'হ্যাটট্রিক' করলেন। মাঝে অবশ্য ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি।

আজ গাভাসকার আবার বলেছেন, তিনি আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অধিনায়কত্ব করতে পারবেন না। ও-দেশে তিনি যেতে চান না। কারণ হিসাবে বলেছেন, গত ১৮ মাসে তিনি এত বেশি টেস্ট-ক্রিকেট খেলেছেন যে, এখন তাঁর কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। ওই সিরিজের পরে তিনি আবার দেশের হয়ে খেলতে রাজি। ভবিষ্যতের অধিনায়ককে 'তৈরি' হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেও অধিনায়ক থাকছেন না। তাঁর জায়গায় এসেছেন বিশ্বনাথ।



ইডেনে সুনীল। বল মেরে দৌড় শুরু করবার ঠিক আগের মুহূর্তে

ভারতের ক্রিকেট-ইতিহাসে অধিনায়কের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার দৃষ্টান্তটি নজিরহীন। গাভাসকার হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গত প্রুডেনশিয়াল কাপ এবং ইংল্যান্ড-সিরিজের কথা। অনেকে বলেন যে, গাভাসকার তখন প্যাকারের দলে যাবেন বলে মনস্থির করায় ক্রিকেট বোর্ড

তাঁকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

আসল কারণ অবশ্য অন্য কিছুও হতে পারে। সেই সফরে গাভাসকার অধিনায়ক হতে চাননি, যদিও তার ঠিক আগেই তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতেন। এবারও বিদেশ-সফরে তিনি যেতে চাইছেন না, সুতরাং তাঁর অধিনায়ক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আরও কারণ আছে। ১৯৭৬ সালে লেখা 'সানি ডেজ' বইতে সুনীল ত্রিনিদাদের লোকেদের সম্বন্ধে এমন কটু মন্তব্য করেছেন যে, সেখানে তাঁর পক্ষে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। তিনি লিখেছেন, ওখানকার লোকেরা একেবারে গেছো, তাদের গাছেই ফিরে যাওয়া উচিত।

এই ধরনের মন্তব্যে ওঁদের ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

এদিকে আবার একটি গুজবও শোনা যাচ্ছে। গাভাসকার সফরে যেতে না চেয়ে চাপ সৃষ্টি করছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন, এইভাবে ক্রিকেট-বোর্ডের কাছে নিজেকে 'অপরিহার্য' করে তুলে তিনি তাঁর পারি-শ্রমিকের অঙ্ক বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

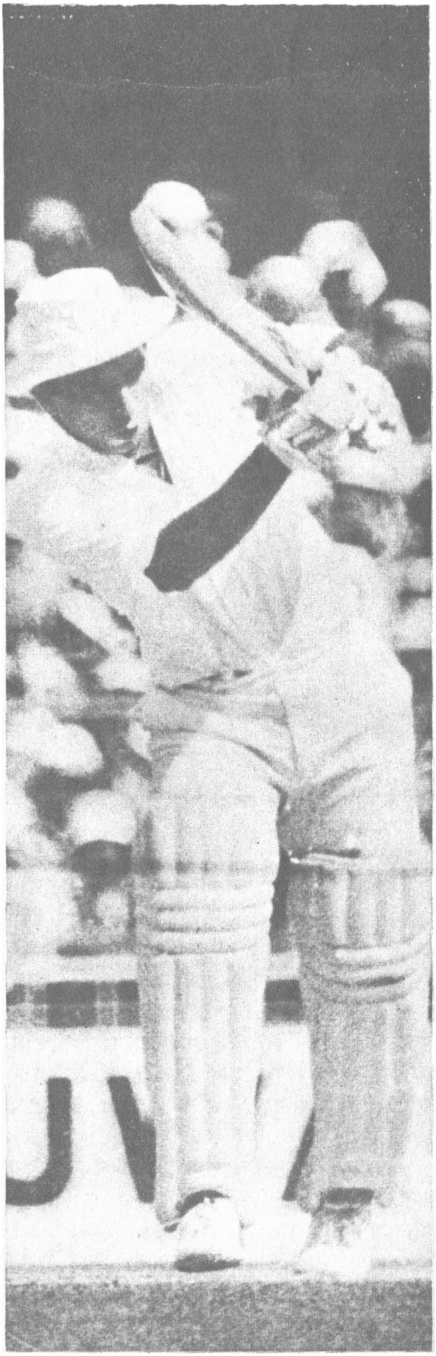
শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। গাভাস-কারকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন বোর্ডকে লিখে জানান যে, তিনি বিদেশ-সফরে যেতে প্রস্তুত। না হলে তাঁকে দলে নেওয়ার প্রশ্নই উঠবে না।

এর ফল হল এই যে, আরও সাতটি সেঞ্চুরি করে ব্র্যাডম্যানের সংখ্যা অতিক্রম করার রেকর্ড তৈরি করতে সুনীলের আরও অনেক সময় লেগে যাবে।

হয়তো পরের অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তান সফরের শেষেই পরিসংখ্যান বলবে, পৃথিবীতে গাভাসকারের চেয়ে ভাল ব্যাটসম্যান কখনও দেখা যায়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে গাভাসকার প্রতিবারই খুব ভাল খেলে থাকেন। ওই দ্বীপপুঞ্জে গেলে হয়তো অনেক আগেই তিনি বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের খেতাব পেয়ে যেতেন।

কিন্তু গাভাসকার যাচ্ছেন না। আশা করা যায়, তার পরের দুটি বিদেশ-সফরে অংশ নিলে গাভাসকার খ্যাতির তুঙ্গে উঠবেন।



ইডেনে সুনীল। ইমরানের বল পত্রপাঠ বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছেন

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত



মজার মানুষ আলি

তুষার পণ্ডিত

ষোলোই জানুয়ারির আনন্দমেলার প্রচ্ছদ-চিত্র দেখে আলি তো অবাক। বললেন, "এ কী! আমার মুখে সিগারেট এল কোত্থেকে!" উত্তরে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, "একটু নজর করে দেখুন, ওটা সিগারেট নয়, দেশলাইয়ের কাঠি।" শুনে একগাল হেসে আলি বললেন, "তাই বলো! আমি কখখনো সিগারেট খাই না।"

আনন্দমেলা যে ছোটদের কাগজ, এইটে শুনে আলি তো দারুণ খুশি। বললেন, "কী জানো, ছোটদের আমি দারুণ ভালবাসি।"

ছোটরাই কি তাঁকে কম ভালবাসে নাকি! দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ—কত জায়গায় তো আলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলুম, সব জায়গাতেই ছোটদের মধ্যে দেখলুম তিনি দারুণ সাড়া জাগিয়ে দিয়েছেন। আলিও যেখানেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখেছেন, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়েছেন, কোলে টেনে নিয়েছেন, আদর করেছেন, অটোগ্রাফের খাতায় সই করতেও একটু আপত্তি করেননি। কথায়-কথায় তিনি বলেন, "কিডস ফার্স্ট।"

দিল্লির দামি হোটেল মৌর্য-শেরাটনের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছি, আলিও দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি এলেই আমরা এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হব। চারপাশে সব অটোগ্রাফ-শিকারির ভিড়, খচাখচ সই করছেন, মুখও চলছে সমানে। এরই মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, বছর-সাতেকের ছোট্ট একটি ছেলে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। আলি তো তক্ষুনি ভিড় ঠেলে সেই ছেলেটির কাছে গিয়ে হাজির। অটোগ্রাফের খাতাটা টেনে নিয়ে একটা নয়, দুটো নয়, পর-পর দশটা পাতায় সই করে দিয়ে বললেন, "কী, খুশি তো? একটা নিজে রেখো, অন্যগুলো বন্ধু-বান্ধবদের বিলিয়ে দিও। তাদের কাছে হিরো হয়ে যেতে পারবে।"

একদম বাচ্চারা কিন্তু আলিকে কোনো পাত্তাই দেয়নি। বরং আলিই সারাক্ষণ তাদের খুশি করবার চেষ্টা করেছেন। কথায় কথায় আলি আমাকে বললেন, "ভারতবর্ষে এসে ইতিমধ্যে বোধহয় লাখখানেক সই দিয়েছি। আমার জীবনে কখনো এত কাজ করিনি।" কিন্তু বয়েস যাদের তিন-চারের কম, তারা তো আর সইয়ের মর্ম বোঝে না! তাই আলি যদিও হাত বাড়িয়ে তাদের কোলে করতে চেয়েছেন, তারা কিন্তু দে-ছুট। আলির তাই নিয়ে দারুণ দুঃখ।

আলি মানুষটি বড় মজার। গল্পে ঠাট্টায় হরেকরকমের ভাবভঙ্গিতে সক্কলকে তিনি মাতিয়ে রাখেন। নিজেকে এখন আর 'গ্রেটেস্ট' বলেন না। "কী করে বলব, এখন তো আমি বক্সিং ছেড়ে দিয়েছি। আর তাছাড়া, বক্সিং যখন করতুম, নিজেকে তখন গ্রেটেস্ট বলতুম

কেন জানো? স্রেফ টাকা কামাবার জন্য। সাদা চামড়ার লোকরা তো আর কালা আদমির হামবড়াই সহ্য করতে পারে না। বড় বড় কথা বলতুম বলে তারা আমার উপর হাড়ে-হাড়ে চটা ছিল। তাই বারবার ওরা পয়সা খরচা করে এই ভেবে আমার লড়াই দেখতে আসত যে, এবারে আমি নির্ঘাত হারব। ওরা পনেরো বছর ধরে আমাকে টাকা দিয়ে গেছে, আমি হারিনি।"

মুষ্টিযুদ্ধে আলি এ-যাবৎ আয় করেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। "কিন্তু," আলি দুঃখ করে বললেন, "তার বেশির ভাগই গেছে আয়কর মেটাতে। রিটায়ার করার পর তো মহা মুশকিলে পড়ে গেছি, কী করে যে সংসার চলবে জানি না।" এটাও অবশ্য মজার কথাই, কেননা, আয়কর দিয়েও যা তাঁর থেকেছে সেই অঙ্কটাও নেহাত কম নয়।

শুনেছিলাম, আলি বড় আত্মম্ভরি, অহংকারী, বদমেজাজি মানুষ। কাছাকাছি এসে দেখলুম, মোটেই তা নন। ঠাট্টায় পরিহাসে সব সময় যেন টগবগ করছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর পয়লা নম্বর মুষ্টিযোদ্ধা

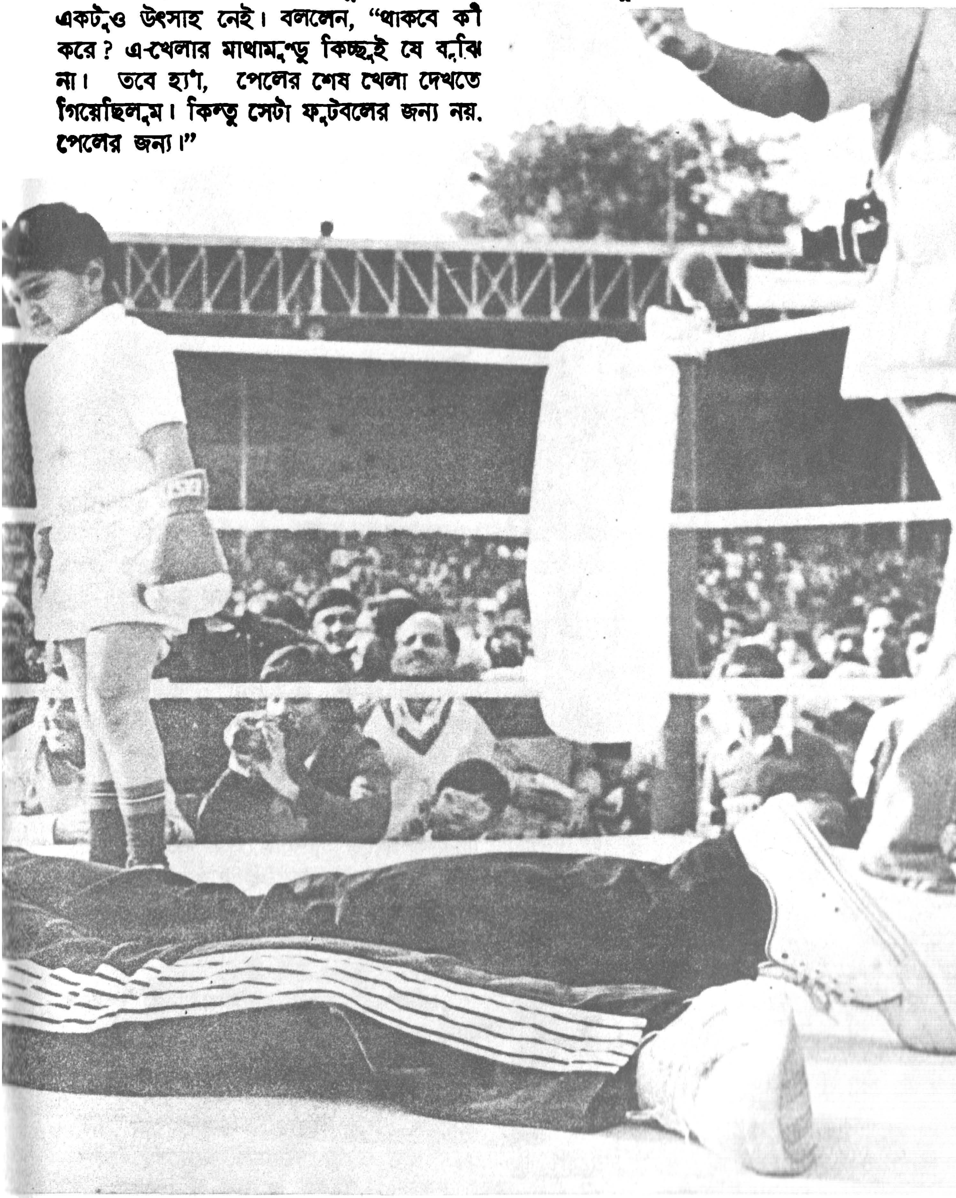


দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ছ বছরের এক শিশুর ঘুঁষিতে আলি কুপোকাত!

জ্যাক জনসন, তার পরে পর-পর আসবেন জো লুই, আলি নিজে, রকি মার্সিয়ানো, ফ্লয়েড প্যাটারসন, জ্যাক ডেম্পসি।

এবারে সর্বশেষে আর একটা মজার কথা বলি। ফুটবল নিয়ে তো আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। আলির কিন্তু এ-ব্যাপারে একটুও উৎসাহ নেই। বললেন, "থাকবে কী করে? এ-খেলার মাথামুণ্ডু কিচ্ছুই যে বুঝি না। তবে হ্যাঁ, পেলের শেষ খেলা দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেটা ফুটবলের জন্য নয়. পেলের জন্য।"

গাভাসকার চান তাঁর ছেলে ক্রিকেটার হোক। কিন্তু ছেলে বক্সার হোক আলি এটা একেবারেই চান না। জিজ্ঞেস করলুম, "তাহলে সে কী হবে?" উত্তরে আলি একগাল হেসে বললেন, "ডাক্তার, উকিল অধ্যাপক—যা খুশি হোক, কিন্তু বক্সার যেন না হয়।"



ফোটো : রঘু রাই

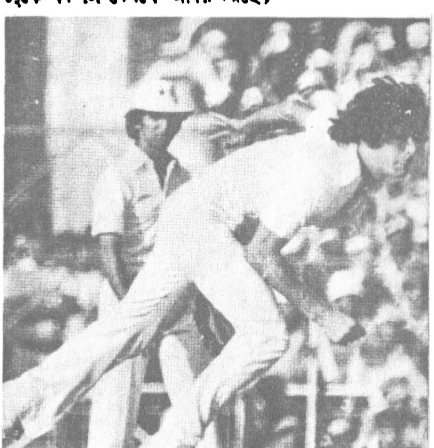


সুনীলের ছেলে রোহন (জল-বিরতির সময়ে মাঠে ঢুকে কপিল দেবকে আদর করছে)



ফোটো: অলক মিত্র

আসিফ ইকবাল (পরাস্ত, কিন্তু মহিমময়)



ইমরান খাঁ (ভয়-জাগানো বোলার)

ইডেনে ড্র

আলোক দাশগুপ্ত

কলকাতার মানুষ আসিফ ইকবালকে মনে রাখবেন—একটি প্রাণহীন ম্যাচকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি। ভারতের ৩৩১ রানের জবাবে পাকিস্তান চার উইকেটে ২৬৩ রানে যখন তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করল, তখন সবাই ধরেই নিয়েছিলেন ম্যাচ ড্র হচ্ছে। ষষ্ঠ টেস্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গেছে, কিন্তু দু'দিন ধরে উত্তেজনায় টগবগ করেছে ইডেনের দর্শক।

চতুর্থ দিনের শুরুতে মাত্র ১১টি বল খেলে ওয়াসিম রাজাকে সঙ্গে নিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়ালেন আসিফ। এক মুহূর্তের জন্য অনেকেই বুঝতে পারেননি কী ঘটে গেল। পরের মুহূর্তেই হাজার-হাজার করতালি অভিনন্দিত করল পাকিস্তান অধিনায়ককে।

জীবনের শেষ টেস্টে অসাধারণ স্পোর্টস-ম্যানশিপের নিদর্শন রেখে গেলেন আসিফ ইকবাল। তাঁর নিজের কথায় : 'ম্যাচের আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি'। ঊনষাট রান পিছনে থেকে দান ছেড়ে দেওয়াকে অনেকেই বলেছেন 'গ্যাম্বলিং'। কিন্তু আসিফ মনে করেন ওটা

'ক্যালকুলেটেড রিস্ক'।

ম্যাচের প্রায় শুরু থেকেই ক্লাব হাউসের দিকে উইকেটের এক জায়গায় ক্ষত (প্যাচ) সৃষ্টি হয়েছিল, যেখান থেকে মাঝে-মাঝে বিশ্রীভাবে বল লাফাচ্ছিল। ঐ ক্ষতকে কাজে লাগিয়ে ইমরান প্রথম ইনিংসে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন। চতুর্থ দিনে উইকেটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। অতএব আসিফ টের পেয়েছিলেন ইমরান দ্বিতীয় ইনিংসেও সফল হবেন। এছাড়া আসিফ জানতেন, ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসমান সুনীল গাভাসকার টনসিলের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন এবং ইনিংসের সূচনা করতে পারবেন না। অতএব ভারতকে যদি অল্প রানে আউট করে দেওয়া যায়, তবে ষষ্ঠ টেস্ট জেতা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়—বিশেষ করে পিটিয়ে রান তুলতে পারেন বলে পাকিস্তানি ব্যাটসমানদের যখন সুনাম রয়েছে।

কিন্তু আসিফের সাধ পূর্ণ হয়নি। ইমরান দারুণ বল করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে উপযুক্ত সাহায্য দেবার মতো বোলার পাকিস্তান দলে কেউ ছিলেন না। তাই মাত্র ৪৮ রানে চার উইকেট খুইয়েও ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের রান ২০৫ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যাপারে সব থেকে বেশি প্রশংসা প্রাপ্য ভারতের শেষ জুড়ি কারসন ঘাউড়ি (৩৭ নট আউট) এবং দিলীপ দোশির (৬)। এঁরা যে শুধু ৩২ রান যোগ করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা উইকেটে থেকে পাকিস্তানের জয়ের পথে মস্ত বাধা সৃষ্টি করেছেন।

তবু এক সময়ে মনে হচ্ছিল, পাকিস্তান ষষ্ঠ টেস্ট জিততে বসেছে, বিশেষ করে যখন রাজা ও জাভেদ মিয়াঁদাদ, বা মিয়াঁদাদ ও আসিফ জুড়ি ব্যাট করছিলেন। রাজা একটি বিতর্কিত রান - আউটের শিকার হয়েছেন। আর আসিফের দুর্ভাগ্য, জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে পা পিছলে রান আউট হয়ে গেলেন। আসিফ এবং মিয়াঁদাদকে বলা হয়ে থাকে ''ফাস্টেস্ট রানার বিটউইন দ্য উইকেটস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড''—অর্থাৎ ব্যাট করার সময় এঁরা দু'জন সব থেকে দ্রুত গতিতে রান নিয়ে থাকেন। সেই নমুনা দেখার সুযোগ হল কলকাতার দর্শকদের। বল ঠেলেই রান নিচ্ছিলেন আসিফ ও মিয়াঁদাদ, এবং যতক্ষণ



সন্দীপ পাতিল (বেপরোয়া ব্যাটসম্যান)

এঁরা দু'জন ক্রীজে ছিলেন, ম্যাচটি ছিল উত্তেজনার তুঙ্গে।

ইডেন টেস্ট কিছু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে অনবদ্য ৯০ রানের ইনিংস উপহার দিলেন তাসলিম আরিফ। মাত্র চার রানের মাথায় ঘাউড়ির বলে স্লিপে বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ দিয়ে রেহাই পাওয়ার পর তাঁর ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি চোস্ত মার এবং বলিষ্ঠ ডিফেন্স। অবাক হয়ে

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তাসলিম এতদিন পাকিস্তান-দলে ঠাঁই পাননি কেন? তাঁর দুর্ভাগ্য, প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরি পেলেন না। দুর্ভাগ্যই বলব, কারণ কপিলের বলে ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে চৌহান যে-রকম তৎপরতায় ক্যাচটি লুফে তাসলিমকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেন, তা অবিশ্বাস্য পর্যায়ের।

তাসলিম আরিফের উইকেট কপিলদেবের শততম টেস্ট উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে সাত রান করার সময় কপিল টেস্টে তাঁর হাজার রানও পূর্ণ করেন। শত উইকেট পাবার ব্যাপারে কপিলই প্রথম ভারতীয় পেস বোলার। ভিনু মাঁকড়ের ২৩টি টেস্টে 'ডাবলের' পরই দ্রুততম টেস্ট 'ডাবল' কপিলদেবের (২৫টি টেস্টে)। স্বয়ং পাক অধিনায়ক আসিফ ইকবাল মন্তব্য করেছেন, কপিলদেব এখন পৃথিবীর সেরা অল-রাউন্ডারদের অন্যতম এবং তাঁর অসাধারণ দক্ষতাই এই সিরিজে ভারতের রাবার জয় সম্ভব করে তুলেছে।

ইডেনে ভাল ব্যাটিংয়ের জন্য তারিফ কুড়িয়েছেন ভারতের সন্দীপ পাতিল, যশপাল, গাভাসকার ও ঘাউড়ি এবং পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ, মজিদ খাঁ এবং ওয়াসিম রাজা। গাভাসকারের দুর্ভাগ্য, দুই ইনিংসেই ইমরানের বল বিশ্রীভাবে লাফিয়ে উঠে তাঁর উইকেট নিয়ে গেল। টসে জেতা ছাড়া অধিনায়ক বিশ্বনাথের কাছে এ-টেস্ট মোটেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে না।

তবে ইডেনের দর্শক নিশ্চয় মনে রাখবেন ইমরানের বোলিং। হল, গিলক্রিস্ট এবং অ্যানডি রবার্টসের পর সত্যিকারের ফাস্ট বোলিং উপহার দিয়ে গেলেন পাকিস্তানের এই সুদর্শন খেলোয়াড়। এই টেস্টে তাঁর সংগ্রহ নয়টি উইকেট। ভারতের ২—০ জয় নিঃসন্দেহে ভাল খেলার পুরস্কার। কিন্তু ইডেনে ইমরানের বোলিং দেখে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এই সিরিজে পিঠের ব্যথায় উনি যদি কাহিল না হতেন, বা ইমরানকে সাহায্য করার মত আর একজন পেস বোলার যদি পাকিস্তান দলে থাকতেন, তবে ভারতের রাবার-জয় এতটা সহজ হত না।

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

আমুর

দিদিমণি

আমুর এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের নদী এবং কোনো কোনো অংশে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সীমানা নির্ধারণ করছে। এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে উত্তর-পূর্ব চীনের উত্তর সীমায়, তারপর মঙ্গোলিয়ার মধ্যভাগ এবং সেই অংশের সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খাবারভস্কের কাছ দিয়ে বয়ে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে গেছে, তারপর তাতার প্রণালীতে গিয়ে মিশেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্বতম সীমান্তের এইটিই দীর্ঘতম নদী। এর চীনা নাম হেই-লুঙ-চিয়াং —অর্থ কালো-ড্রাগন নদী। মঙ্গোলিয়ায় এই নদীর নাম খারামুরেন—অর্থাৎ কালো নদী।

নদীটির দৈর্ঘ্য ২,৮২৪ কিলোমিটার। শিল্কা ও আরগুন নামে দুটি নদী মিলে এই নদীর উৎপত্তি। নদীটির গতিপথে অনেক উপনদী এসে মিশেছে—হ্রদও আছে অনেক। উপনদীর মধ্যে জেয়া, বুরোয়া, সুনগারি উস্সুরি এবং আমগুন প্রধান।

শিল্কা এবং আরগুন নদী পরস্পর মিশে যাওয়ার পর আমুর নদীর উচ্চভাগের শুরু এবং প্রায় ৫৫০ মাইল বয়ে যাওয়ার পর জেয়া নদীর সঙ্গে মিশে তার সমাপ্তি। খাবারভস্ক্ পর্যন্ত আরও ৬০০ মাইল আমুর নদীর মধ্যভাগ এবং তারপর আরও ৬০০ মাইল বয়ে যাওয়ার পর মোহনায় গিয়ে শেষ হচ্ছে নদীর নিম্নভাগ।

উচ্চভাগে এই নদী খিনগান্ পর্বতের বিস্তৃত অংশ ও আমজারস্কি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এর পরে নদীটি মালভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করে। আগ্নেয় শিলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় কোথাও কোথাও জল গরম হয়ে ক্রমাগত বাষ্পের সৃষ্টি হয়, এবং কখনও কখনও আগুনের শিখাও দেখা [illegible]। নদীর বাঁ তীর সমতলভূমির সঙ্গে [illegible] গেছে, ডান তীরে আছে খিনগান পাহাড়ের [illegible]।



নদীর নিম্নভাগে অনেক জলাভূমি আছে। নদীখাত অনেক জায়গায় খুবই চওড়া। নভয়ের কাছে আমুর বৃহত্তম উপনদী সুনগারির সঙ্গে মিশেছে। খাবারভস্কের কাছে উস্সুরি আমুর নদীতে এসে মিশেছে। এইসব উপনদীর জলে পুষ্ট আমুর নদীর দুকূল ছাপিয়ে ওঠে এবং জলাভূমিতে ভরা সমতলভূমির ওপর দিয়ে নদীটি বয়ে যেতে থাকে। এইখানে নদী অনেক দ্বীপ, বালির চড়া, খাল-বিলের সৃষ্টি করেছে, ফলে নদীতে যখন জল বেশি থাকে তখন এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটাই একটা বড় হ্রদের মতো মনে হয়। গতিপথে পাহাড় থাকার দরুন এই নদী জাপান সাগরের কাছাকাছি এসেও উত্তর দিকে বেঁকে আরও ৬০০ মাইল বয়ে গিয়ে একটি চওড়া এবং প্রায় তিরিশ মাইল লম্বা খাড়ি তৈরি করে তাতার প্রণালীতে গিয়ে মিশেছে।

নদীর অববাহিকা অঞ্চলের জলবায়ু মোসুমী। শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে বয়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। এ সময়ে বৃষ্টি পড়ে না। তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও নীচে নেমে যায়। জুলাই-অগাস্ট মাসে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি।

আমুর নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদীর জলধারা পুষ্ট হয় প্রধানত বৃষ্টির এবং পাহাড়ের বরফগলা জলে। জলবৃদ্ধির জন্যে নদীতে মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বন্যাও হয়। মার্চ-এপ্রিলে জলের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে। অক্টোবরের মাঝামাঝি বরফ জমতে শুরু করে। নদীর বাঁকে বরফে আটকে গিয়ে জল অনেক সময় পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠে।

আমুর নদী বছরে ছ মাস নৌ-বাহনযোগ্য। নদীর দুই তীরে অনেক বন্দর আছে।

বাঘা ১



চ দাদা আমিও তোর সঙ্গে দৌড়ে আসি।
না।
কেন?
তুই যে বড্ড ছোট!
হাঁপিয়ে যাবি
না, হাঁপিয়ে যাব না!
ক্লান্ত হয়ে পড়বি!
না, ক্লান্ত হব না।
কী রে দাদা, যাব?
না
বেশ, তাহলে তোর সঙ্গে আড়ি আড়ি আড়ি!

বাঘা ২



আমার সাইকেলের রেঞ্চটা কোথায় রে?
হারুকে ধার দিয়েছি!
কীরে হারু, আমার রেঞ্চটা কোথায়?
সোনাকে ধার দিয়েছি!
সোনা, আমার রেঞ্চটা তোর কাছে?
সেটা কাল জলিকে ধার দিলুম যে!
জলি, আমার রেঞ্চটা দে!
সেটা তো বুকু নিয়ে গেল!
বুকু, আমার রেঞ্চটা কোথায়?
বা রে...
ওটা তো আমিই তোকে ধার দিয়েছিলুম!
8-19

হাওড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। হাওড়ার সরকারি দফতরখানা কোর্ট-গির্জা ও কবরখানার কাছে ফাঁসিতলার বিরাট মাঠের এক কোণে ছিল ইংরেজদের নাচঘর। ওই



নাচঘরেই ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল হাওড়া গভর্নমেন্ট স্কুল। এখনকার নাম হাওড়া জিলা স্কুল।

প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্যর মুখে হাওড়া জিলা স্কুলের ইতিহাস শুনতে শুনতে চলে গিয়েছিলাম সেই সুদূর অতীতে, যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে স্কুল খুলে চলেছেন। হাওড়ার গভর্নমেন্ট স্কুলকেও ঐ পুরুষসিংহের উদ্যোগের ফল বলা যেতে পারে। আরও দুটি বিখ্যাত নাম হাওড়ার এই সরকারি স্কুলটির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত—প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন পরলোকগত এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখোপাধায়, শ্রী করুণাকেতন সেন, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রী ভট্টাচার্য ৩৬ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। ও'র বিষয় ইংরেজি।

বোর্ডের পরীক্ষায় আপনার স্কুলের ছেলেরা কেমন ফল করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরেই আসে। প্রায় প্রতি বছর সব ছাত্রই মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। বেশির ভাগ ছাত্রই প্রথম বিভাগ পায়। তৃতীয় বিভাগ কেউ পায় না বললেই চলে। গতবার ষোলোজন প্রথম বিভাগে, সতেরজন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে, কেউ ফেল করেনি। ১৯৭৮ সালে ৩৪ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে ৩০ জন প্রথম বিভাগে এবং মাত্র চারজন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। এই স্কুলের ছাত্ররা স্ট্যান্ড করেছে অনেকবার।"

শ্রীভট্টাচার্যের মতে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে ছাত্রদের উচিত যথাযথ উত্তর দেওয়া। ছোটর ওপর গুছিয়ে লেখার ওপরই বেশি জোর দিতে হবে। সাধারণ ছেলেরা যদি সঠিক উত্তর দিতে দিতে নাও পারে, উত্তরটা যেন প্রশ্নের কাছাকাছি হয়। ভাল ছেলেদের লক্ষ রাখতে হবে উত্তর যেন সঠিক হয়, সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর হওয়া চাই। বানান ভুল যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। পূর্ণবাক্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, অর্ধ-সমাপ্ত বাক্যে নয়।

বললাম, "আপনার নিজের বিষয় নিয়ে কিছু বলুন।" বললেন, "ইংরেজিতে যা পড়ানো হয়, তার ওপর মৌখিক প্রশ্ন অভ্যাস করা এবং ছোট ছোট প্রশ্নের ছোট ছোট উত্তর লিখে তৈরি করা উচিত। গ্রামারে একটু বেশি জোর দিতে হবে, বিশেষত 'টেন্স'-এর ওপর, কারণ ছাত্ররা ঐখানেই বেশি ভুল করে। বাক্যের গঠন সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা রাখা দরকার। কোথায় সাবজেক্ট বসবে, কোথায় ভার্ব, কোথায় বা অবজেক্ট বসবে—শিখতে হবে।"

"আর বাংলা?"

"বাংলা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলা যেতে পারে, মাতৃভাষা হলেও ছেলেরা খুব বানান ভুল করে। এটা শোধরাতে হবে। ব্যাকরণও ভালভাবে পড়তে হবে। ছোট ছোট

প্রশ্নের উত্তর ভালভাবে তৈরি করতে হবে।"

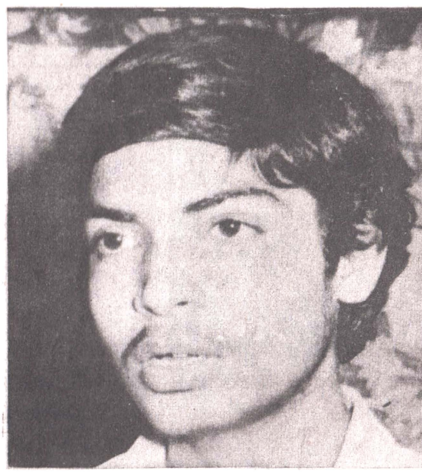
অঙ্ক সম্পর্কে উনি বললেন, "ক্লাসের কাজ মন দিয়ে করলে বাড়ির কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্যের সাহায্য ছাড়াই অঙ্ক কষতে শিখতে হবে। ফিজিক্যাল সায়ান্স এবং লাইফ সায়ান্সে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ সব বিষয় ভালভাবে শিখতে হলে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে।"

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "ভূগোল পড়ার জন্যে ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব, মডেল ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া দরকার। ইতিহাস পড়ার সময়ও ম্যাপের সাহায্য নেওয়া উচিত। সংস্কৃতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক, বিভক্তি, অব্যয় ভালভাবে পড়া উচিত, আর অনুবাদের ওপর জোর দিতে হবে। খাটলে সংস্কৃতে প্রচুর নম্বর ওঠে।"

সবশেষে জিজ্ঞেস করলাম, "যে-সব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভাল স্কুলে পড়তে পায় না, তাদের সম্পর্কে কী ভাবছেন?"

শ্রীভট্টাচার্য বললেন যে, "প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ স্কুলে পড়লেও ভাল ফল করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া। আনন্দমেলার মতো পত্রিকা থেকেও প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায়।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়



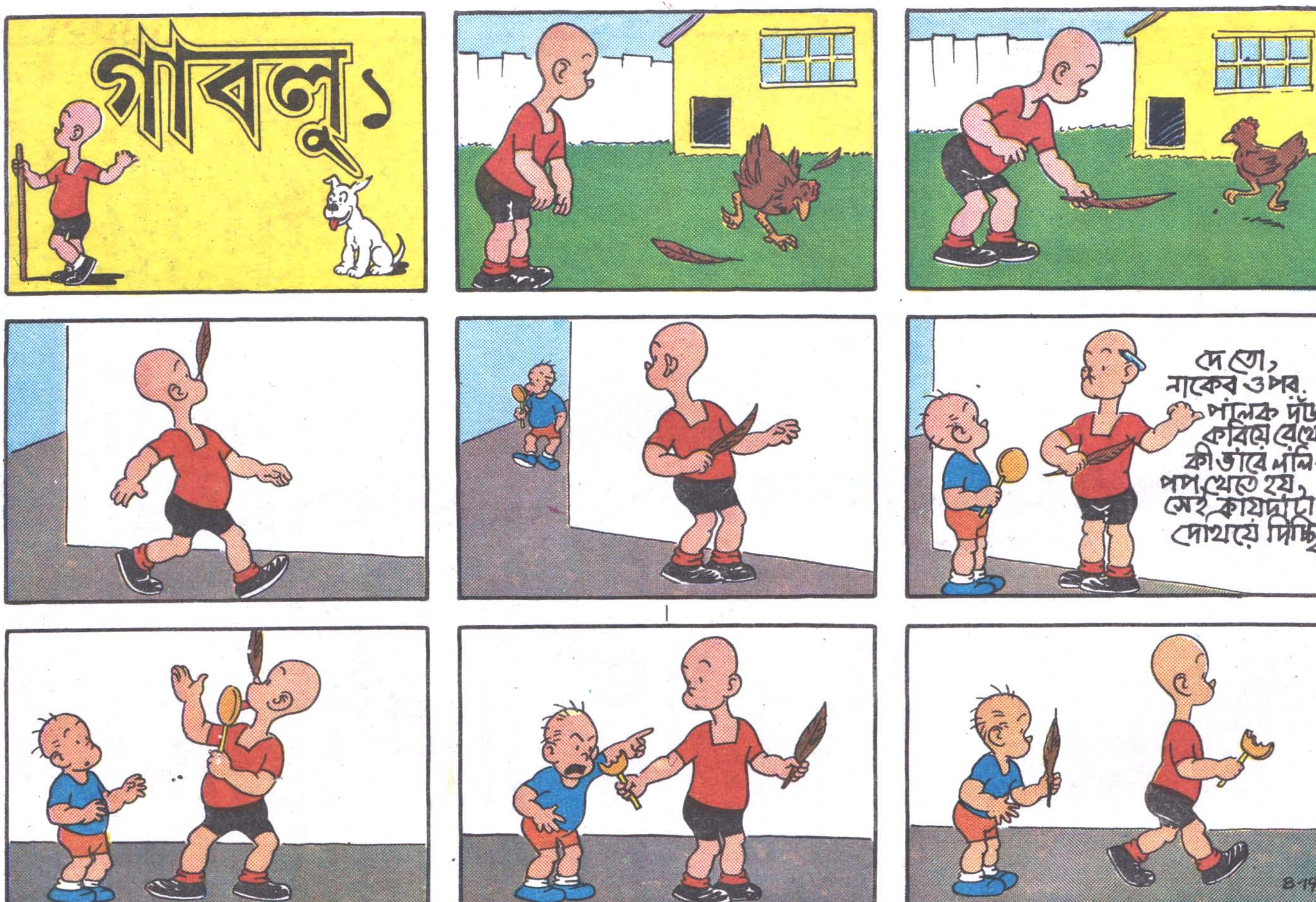
টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে ইন্দ্রনীল গুপ্ত। এই স্কুলে ও থ্রী থেকে পড়ছে। নিচু ক্লাসে ফার্স্ট হত।

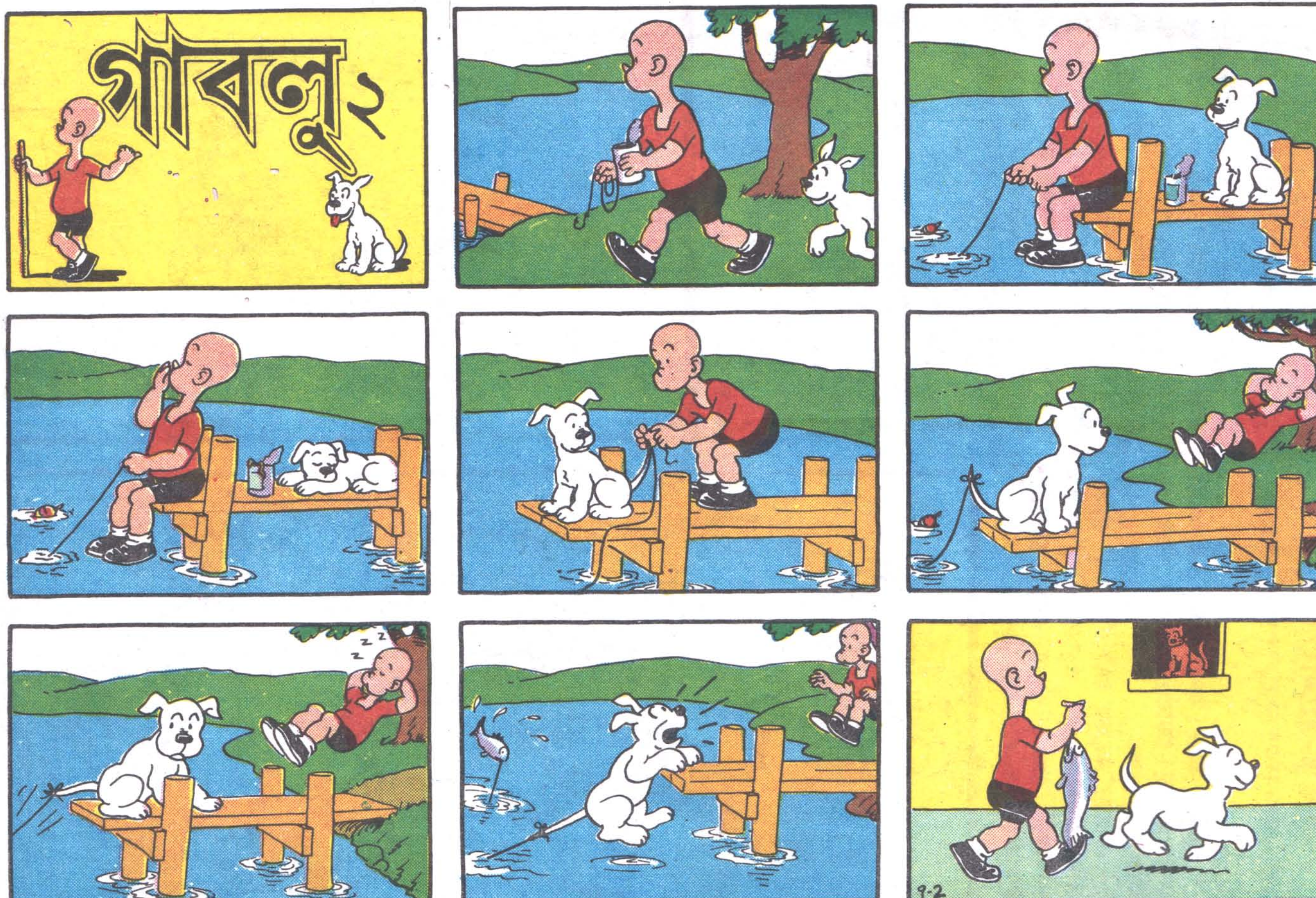
ইন্দ্রনীল দিনে ছ' থেকে সাত ঘণ্টা পড়ে। সকালে চার এবং রাতে তিন ঘণ্টা। দুপুরে লেখার কাজ করে। লেখায় ও পড়ায় প্রায় সমান সময় দেয়। লেখা গৃহশিক্ষক দেখে দেন, কখনও বা স্কুলের শিক্ষকরা। দু'জন গৃহ-শিক্ষক আছেন ইন্দ্রনীলের, একজন বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পড়ান ও আরেকজন সংস্কৃত পড়ান।

ইন্দ্রনীলের সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে গণিত ও লাইফ সায়ান্স। নরেশ সমাজপতির বই থেকে স্কুলে অঙ্ক কষানো হয় এবং ইন্দ্রনীল কেশব নাগ ও দাস-বর্মণের বই থেকেও বাড়িতে অঙ্ক কষে। ফিজিক্যাল সায়ান্সে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই ক্লাসে পড়ানো হয়। কেমিস্ট্রিতে গোস্বামী-সিংহ ও সমর গুহর বইও ইন্দ্রনীল পড়ে, ফিজিক্সে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তর বই অতিরিক্ত হিসেবে পড়ে। লাইফ সায়ান্সে স্কুলে পড়ানো হয় ডঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী এবং ডঃ তারক-মোহন দাসের বই। ইন্দ্রনীল আরও পড়ে সুনীলেন্দু বসাক ও সান্যাল-চট্টোপাধ্যায়ের বই। ইংরেজি গ্রামারে পি কে দে-সরকার এবং রেন অ্যান্ড মার্টিনের বই অনুসরণ করে। বাংলা ব্যাকরণে বামনদেব চক্রবর্তী। ইতিহাসে পড়ে সুশীলকুমার ঘোষের, প্রভাতাংশু মাইতির এবং ডঃ কিরণ চৌধুরীর বই। ভূগোলে উপেন্দ্র রায়, সুভাষরঞ্জন বসু। সংস্কৃতে 'হেল্‌প্‌স টু দা স্টাডি' 'হিন্টস অব স্যাংস্ক্রিট গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন'। এগুলি থেকে অনুবাদ ও কম্পোজিশন করে এবং ব্যাকরণের জন্যে পড়ে ব্যাকরণ কৌমুদী। ইন্দ্রনীলের অতিরিক্ত বিষয় মেকানিকস, স্কুলে পড়ানো হয় কামিনীকুমার দেব-এর বই। লোনির বইও পড়ে। এছাড়া টেস্ট পেপার্স থেকেও অভ্যাস করে।

ইন্দ্রনীল ডাক্তার হতে চায়। স্কুলের পড়াশোনার বাইরে খেলাধুলোয় ঝোঁক আছে ইন্দ্রনীলের। ফুটবল খেলে স্কুলে। ইনডোর গেমের মধ্যে টেবিল টেনিস ও ক্যারাম। ক্যারামে ও স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইন্দ্রনীল আনন্দমেলা নিয়মিত পড়ে।

সাধনা গঙ্গোপাধ্যায়


গাবলু ১
দে তো, নাকের ওপর পালক দাঁড় করিয়ে রেখে কী ভাবে ললি-পপ খেতে হয়, সেই কায়দাটা দেখিয়ে দিচ্ছি!

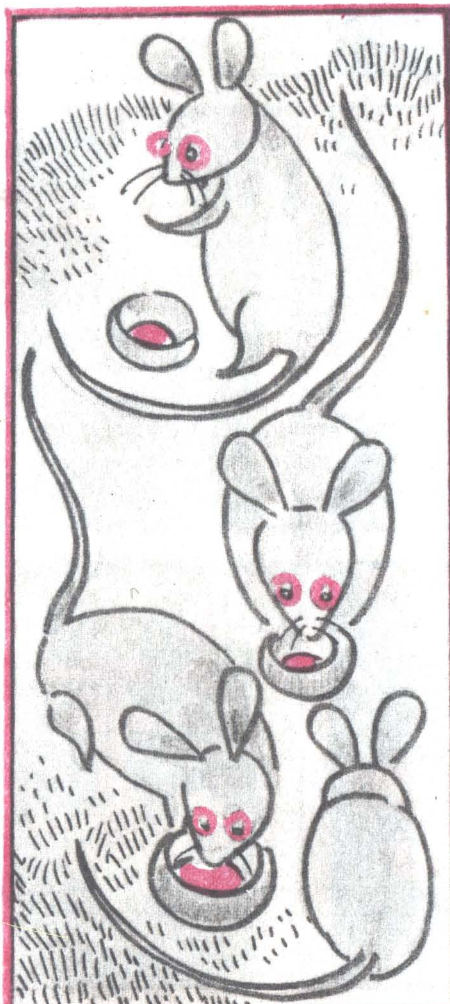

গাবলু ২
৭-২

জন্তু-জানোয়ার—২

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কাছে ইঁদুর আঁকা তো অনেক সোজা হয়েছে। জেনেও ফেলেছ কীভাবে এর আরম্ভ আর শেষ।

এবারের নমুনায় সেই ইঁদুরকে কেমন এদিক-ওদিক করে সহজেই আঁকা গেছে। তুমি শুরু করে দেখো না— আরও কতভাবে ইঁদুর তোমার কাছে ধরা দেয়।

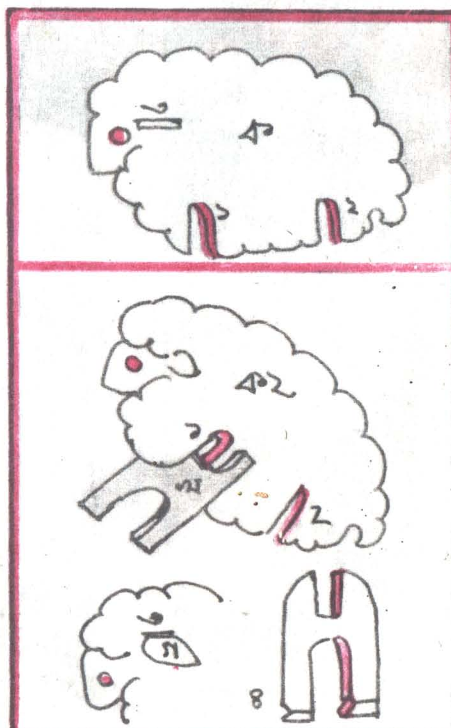


কাগজের খেলনা ঃ ভেড়া—২

কারিগর

এবার ভেড়ার শরীরের (ক) অংশ নিয়ে নীচের দিকে মাপমতো ফাঁক করে কেটে জায়গা (১ নং ও ২ নং ছবি) করে নাও পা আটকাবার জন্যে। কান আটকব্যার জন্যেও চিরে নাও নরুন দিয়ে (৩ নং ছবি)। তৈরি করে রাখা পাগুলি (খ-ছবি) ভেড়ার শরীরে কেটে রাখা (১+২) জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে (ক২ নং ছবি+খ ছবি) দাঁড় করিয়ে দাও। ভেড়ার মাথার কাছে (৩ নং) কাটার মধ্যে কান (গ ছবি) ঢুকিয়ে কাজ শেষ করো। পায়ের খুরের জন্য নীচের দিকে সামান্য খাঁজ কেটে নাও (৪ নং ছবি)।

জেনে রাখো—(১) একটা বোর্ডের গায়ে আর-একটি বোর্ড লাগাবার ফাঁকটির মাপ হবে কাজ করার বোর্ডের মোটার মাপ মতো। (২) খেলনা রং করতে চাইলে তুলি-রং দিয়েও যেমন করতে পারো, তেমন রঙিন কাগজ ব্যবহারেও বাধা নেই। চোখের জন্যে রঙিন পুঁতি দেখতে সুন্দর হবে।




ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!
ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে,
পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।
ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ– যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।
কি ক'রে দেখুনঃ
* প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
* ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
* ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।
অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।
১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমূলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।
২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।
৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
Clearasil
SKIN COLOURED MEDICATION
Greaseless Medication for Acne Pimples and Blemishes
মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য,
জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!
বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম
OBM 2115 BN


রাম ও শ্যাম
আর ছেলেধরা
রাম ও শ্যাম মেলায় ঘুরছে মজা করে, হঠাৎ তারা শুনলো চিৎকার তারস্বরে!
বাঁচাও!
"এস শ্যাম, দৌড়ই চটপট করে, মনে হয় কেউ যেন বিপদে যে পড়ে!"
"ঐ দেখো, ছেলেধরা পালায় যে ছুটে, ও পাড়ার বাবলুকে নিয়ে গেলো লুটে!"
"ছোঁড়বার মত ঢিল নেই কাছে-পিঠে, ব্যাটাকে যে মারবো এই দিয়ে এক টিপে!"
বনবন স্পীডে পপিন্স ছুটলো ফটাফট ছেলেধরার মাথায় জোরে লাগলো সটাসট!
"বাপরে" বলে চোর পড়লো যে ঢলে, ছোট্ট বাবলু ফিরে এল বাপ-মার কোলে!
আবার এলো জীবন জুড়ে খুশীর জোয়ার সবারই সুখে মুখে পপিন্সের জয়-জয়কার!
খেতে ভাল দেখতে ভাল ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
মিষ্টি ফলার
PARLE POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদ ভরপুর— রাস্পবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মুসম্বী।